ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস–১

প্রাক-ইতিহাস

ইরফান হাবিব

ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস — ১

প্রাক-ইতিহাস

ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস — ১

প্রাক-ইতিহাস

ইরফান হাবিব

ভাষান্তর

কাবেরী বসু

এন বি এ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

প্রাক-ইতিহাস

Peoples' History of India - 1
PRE-HISTORY in Bengali
by Irfan Habib

ISBN : 81-7626-109-2

প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০২
দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৩
তৃতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০০৪
চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ২০০৬
পঞ্চম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০৮
ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩

প্রকাশক
অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রা লি
৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
ইন্দ্রজিৎ নারায়ণ

দাম ষাট টাকা

প্রকাশকের কথা

'পপুলার সায়েন্স' বা সোজা বাংলায় 'সব মানুষের জন্য বিজ্ঞান' এমন প্রচেষ্টার সঙ্গে এখন আমাদের বেশ জানাশোনা। গণিতের কঠিন খোলা ভেদ করে বিজ্ঞানের মোদ্দা সার কথাটুকু সব মানুষের বোধের জগতে পৌঁছে দেবার এই চেষ্টা বহুদিনের। কিন্তু ইতিহাসের বেলায় এমন প্রয়াস বেশ অপ্রতুল। অথচ এখানে-সেখানে খুঁজে পাওয়া যুগসাক্ষরের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি পরম্পরায় অনুমানের পর অনুমান বিন্যস্ত করেই পাওয়া যায় ইতিহাসের তত্ত্ব। 'অনুমান'-এর শরীরে 'বিজ্ঞান' আর 'যুক্তি'-র চিহ্ন বসালেও সংশয় আর বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে তার মুক্তি মেলে না। এই মুক্তির সন্ধান দিতে কলম ধরেছেন মাননীয় ইরফান হাবিব। লিখতে বসেছেন ভারতবর্ষের অগণিত সাধারণের ইতিহাস, সহজ বোধগম্য ভাষায়। 'প্রথম যুগের উদয়-দিগঙ্গনে প্রথম দিনের ঊষা নেমে এল' কবে— তারই উত্তর সন্ধানে বিদ্বৎজনের পথপরিক্রমার হিসেব নিকেশ করেছেন তিনি। প্রাক-ইতিহাস থেকে খ্রীষ্টপূর্ব 3,000 অব্দের নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতা— এই পর্যন্ত প্রথম খণ্ডের ব্যাপ্তি।

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে, ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ও উগ্র স্বজাত্যভিমানী ব্যাখ্যাকে প্রতিরোধ করতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন আলিগড় ঐতিহাসিক সোসাইটি। বর্তমানে ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস গ্রথিত করার একটি পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছেন। এর পাশাপাশি সহজবোধ্য ভাষায় ভারতবর্ষের মানবজীবনের বিবরণ কথা কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশের এই উদ্যোগও তাঁদেরই।

প্রতিটি বিবরণ কথা ইরফান হাবিবের সযত্ন রচনায় অথবা সম্পাদনায় সমৃদ্ধ। প্রথামাফিক ইতিহাস পড়েননি অথচ ইতিহাসে প্রবল আগ্রহী মানুষজনকে সমৃদ্ধ করবে তাঁর প্রাঞ্জল লেখনী। কেবল বিজ্ঞান নয়, সব মানুষের বোধের জগতে পৌঁছে যাক ইতিহাসও— এই আমাদের আশা।

ইরফান হাবিব

আলিগড় মুসলিম বিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক, মধ্যযুগের ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক।

দি অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইন্ডিয়া (1963), অ্যান অ্যাটলাস অফ দি মুঘল এম্পায়ার (1982), এস্যেজ ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি : টুওয়ার্ডস এ মার্কসিস্ট পারসেপশান (1995) ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা।

মুখবন্ধ

আপনার হাতের মুঠোয় ধরা প্রাক-ইতিহাসের এই যে রচনাসম্ভার এতে রয়েছে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন সময়কালের মানবজীবনের বিবরণ-কথা। অনেক কাল আগের কথা; কোনো লিপিবদ্ধ কথাচিত্রের আলোয় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এই প্রাচীন অন্ধকার উদ্ভাসিত হবারও আগের সময়কথা। ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস— সে এক বিশাল পরিকল্পনা। এ হলো তারই একাংশ কিন্তু আপনাতে আপনি সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার এক আকাঙ্ক্ষা। প্রথম অধ্যায়ে ভারতের ভূতাত্ত্বিক গঠন প্রক্রিয়া, তার জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের (সাধারণ উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল) পরিবর্তনের কথা আলোচিত হয়েছে। অবশ্যই ইতিহাস এবং প্রাক-ইতিহাসের সঙ্গে যতটুকু প্রাসঙ্গিক ততটুকুই, তার বেশি নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গোটা বিশ্বের প্রেক্ষিতে মানুষের ইতিবৃত্ত আর তারপরে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে তার কাহিনীপট। কেবলি বদলে-যাওয়া কাজের হাতিয়ারে সংশ্লিষ্ট এদের স্রষ্টা এক মানব গোষ্ঠীর কাহিনী। প্রধানত কৃষির আবিষ্কার আর শোষণে-গড়া সম্পর্কের সূচনাকাল বিবৃত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

প্রামাণ্য রচনায় আর সাময়িক পত্রে একেবারে সাম্প্রতিক যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তারই ভিত্তিতে উপস্থাপনার প্রয়াস করা হয়েছে এই তিনটি অধ্যায়ে।

এই রচনাতে এবং একই সঙ্গে মানুষের-ইতিহাসের পরবর্তী অংশে রচনাশৈলীকে 'লোকপ্রিয়', অলংকৃত কিংবা আষাঢ়ে না করে সরল, অনাড়ম্বর রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক পরিভাষার ব্যবহার যতটা সম্ভব কম করা হয়েছে আর প্রথম ব্যবহারের সময় প্রত্যেকটি পারিভাষিক শব্দের একটা কাজ-চালানো-গোছের ব্যাখ্যা দেবারও চেষ্টা করা হয়েছে। অবিশেষজ্ঞ পাঠকের কাছে পাছে কোনো সংক্ষিপ্ত শব্দরূপ অর্থহীন হয়ে পড়ে, তাই সেগুলোকেও এড়িয়ে চলা হয়েছে। যেমন mya অথবা my অর্থাৎ নিযুত বছর আগে (million years ago), কিংবা kya বা ky অর্থাৎ হাজার বছর

আগে (thousand years ago), AMM (Anatomically Modern Man) অর্থাৎ শারীরিক গঠনানুসারে আধুনিক মানুষ, অথবা 'BP' (Before Present) অর্থাৎ বর্তমান-পূর্ব— এদের একটিও ব্যবহার করা হয়নি। যদিও পাঠকের দৃষ্টিতে এগুলো হলো একটি এক নির্দেশক, আরো বেশি অভিজ্ঞ রচনায় পাঠক এইসব সংক্ষিপ্ত রূপের সম্মুখীন হতে পারে (2.1নং টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে রয়েছে একটি গ্রন্থ-বিবরণী যেখানে সেই অধ্যায়ের বিষয় সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ বই আর নিবন্ধ-সমূহ সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ তালিকাবদ্ধ রয়েছে। কোনো উদ্ধৃতি থাকলে সেটি কোন্ পুস্তক বা রচনার অংশবিশেষ তারও উল্লেখ রয়েছে এখানে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার ব্যবহৃত সমস্ত মুদ্রিত রচনার বিবরণী ঐ তালিকায় নেই, কয়েকটি বিশেষ নির্বাচিত রচনা বা পুস্তকই ঐ গ্রন্থতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যে সমস্ত নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক কিংবা বিতর্কিত প্রসঙ্গ বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে, যেমন — কালপঞ্জীর সমস্যা অথবা নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্ব, তাদের জন্য মূল রচনার একেবারে শেষে বিশেষভাবে দু'একটি কথা উল্লেখিত হয়েছে। এইভাবে প্রথম অধ্যায়ে ভূতাত্ত্বিক যুগ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাগৈতিহাসিক কালনির্ণায়ক পদ্ধতি এবং তৃতীয় অধ্যায়ে মরুভূমির নদী (সরস্বতী) বিতর্ক বিষয়ে পৃথকভাবে অল্প কিছু বলা আছে।

কালানুক্রমিক এবং অন্যান্য সারণী, মানচিত্র, চিত্র সবকিছুই নিজেদের প্রসাদগুণে আকর্ষণীয় ও সাহায্যকারী উপাদান হয়ে উঠবে এই প্রত্যাশা রইলো। আমাদের মানচিত্রে যেখানে আন্তর্জাতিক সীমানাগুলি দেখানো হয়েছে, সেগুলি ভারতের জরিপ-মানচিত্রে রেখাঙ্কিত সীমানার অনুরূপ।

আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা উচিত যে, মানব প্রজাতির সদস্যদের বিশেষ উল্লেখকালে যখন সাধারণভাবে 'মানুষ' বা 'সে' বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে তখন তার অনুষঙ্গে নারী-পুরুষ উভয়কেই যুক্ত করা হয়েছে। বাকরীতির এটুকু অনুমোদন প্রার্থিত। এরকম ব্যবহারে পুরুষতান্ত্রিক উপাদানের ওপর কোনো বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এমন অনুমান অনুচিত হবে।

'ভারতবর্ষ' বলতে প্রাক-1947-কে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ বর্তমান ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এই তিনটি রাষ্ট্রের সম্মিলিত অঞ্চল সেটি। অবশ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি অন্য কোনো ব্যঞ্জনা থাকে তবে সে স্বতন্ত্র কথা। 'দক্ষিণ এশিয়া'-র মধ্যে শ্রীলঙ্কা, নেপাল আর ভূটানকেও যুক্ত করা হয়েছে। 'ভারতীয় জাতিপুঞ্জ' সর্বদাই 1947 পরবর্তী ভারত-সীমান্ত নির্দেশ করে। বর্ণনা প্রসঙ্গে আফগানিস্তান একেবারে স্বাধীন অস্তিত্বে উল্লেখিত এবং পরবর্তী অংশে নেপালের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা বলা যায়।

যাদের উদাত্ত দানে এই উদ্যম সফল হয়েছে, আলিগড় ঐতিহাসিক সোসাইটির পক্ষ থেকে সেই মধ্যপ্রদেশ পাঠ্যপুস্তক কর্পোরেশনের ঋণ স্বীকার পর্বটি আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

মূল আলোচ্যটি বিবিধ ত্রুটিমুক্ত রাখার বিষয় সুনিশ্চিত করতে প্রকাশকালে সমগ্র গ্রন্থটির বিষয়বস্তুকে তিনটি স্তরে প্রচার করা হয়েছে। আমার অনেক বন্ধুর কাছে তাদের সুচিন্তিত মতামতের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এতে বর্ণিত বিষয় এবং শৈলী উভয়ক্ষেত্রেই অনেক বদল ঘটেছে। প্রফেসর সুরজভান আরো অধিক অনুগ্রহে সমগ্র রচনাগুলি পড়েছেন। অবশ্যই বিশেষ ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য।

সমগ্র পরিকল্পনাটি বাস্তবের কঠিন জমিতে প্রোথিত করতে শ্রীসুদীপ ব্যানার্জী আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছেন। সংগঠনের যাবতীয় দায়দায়িত্ব সামলেছেন আমাদের সোসাইটির সম্পাদিকা, শিরীন মুসভি। সযত্নে এই সমগ্র রচনাটি মুদ্রিত করেছেন শ্রীমুনেরুদ্দীন খান। রচনাগুলির অবিরাম পরিবর্তন-প্রবাহ তিনি পুরুষ-পরাক্রমে ধারণ করেছেন।

ফয়েজ হাবিব ও তাঁর অগ্রগণ্য সহকর্মী জাফর আলি খান এই রচনায় সংলগ্ন আটটি মানচিত্রের সবকটি এঁকে দিয়েছেন। চিত্রগুলির শুদ্ধতা নিশ্চিত করতে তাঁদের প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছে। 1.4, 2.1, 2.2 আর 3.1 মানচিত্রগুলির জন্য বেশ ভালোমতোই গবেষণার প্রয়োজন হয়েছিলো সে কথাটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে।

তুলিকার শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ এবং শ্রীযুক্তা ইন্দিরা চন্দ্রশেখরকে অবশ্যই বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো উচিত তাঁদের সদাতৎপর সহযোগিতার জন্যে, বিশেষত প্রথম জনকে; তিনি যে কত বিষয়ে তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন সে কথা বলে শেষ করা যাবে না।

ইরফান হাবিব

বিষয়সূচী

মুখবন্ধ

1. *ভারতবর্ষের ভৌত বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের গড়ন*

1.1 ভারতবর্ষের ভূ-তাত্ত্বিক গড়ন ঃ ১

1.2 মানব অভ্যুদয়ের কাল থেকে প্রাকৃতিক ভারতবর্ষ ৫

1.3 জলবায়ু ৯

1.4 প্রাকৃতিক উদ্ভিদ এবং বন্য প্রাণী ১২

টীকা 1.1 ভূ-তাত্ত্বিক যুগসমূহ ঃ ১৫

1.2 ব্যবহৃত পুস্তকসমূহের টীকা ১৯

2. *আমাদের আদি পূর্বপুরষেরা*

2.1 মানব প্রজাতির বিবর্তন ২১

2.2 ভারতবর্ষে আদি মানুষ ২৬

2.3 শারীরিক গঠনে আধুনিক মানুষ ৩০

2.4 ভারতবর্ষে আধুনিক মানুষ ৩৩

2.5 মধ্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ৩৭

টীকা 2.1 ঃ প্রাক-ইতিহাসের কাল-নির্ণয় পদ্ধতি ৪৪

2.2 ঃ ব্যবহৃত পুস্তক সমূহের টীকা ৪৮

3. *নব্য প্রস্তর যুগের বিপ্লব ঃ কৃষি এবং পশুর গৃহপালনের আবির্ভাব*

3.1 'নব্য প্রস্তর যুগের বিপ্লব' শব্দটির অর্থ ৫০

3.2 পশ্চিম সীমান্তরেখায় প্রথম কৃষিজীবী গোষ্ঠী,
(ক্র.) 7000-4000 খ্রী পূ ৫২
3.3 সিন্ধু অববাহিকায় ব্রোঞ্জ সভ্যতার অভিমুখে ঃ
(ক্র.) 4000-3200 খ্রী পূ ৫৮
3.4 ধান উৎপাদন এবং মধ্য ও পূর্ব ভারতের নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি
(ক্র.) খ্রী পূ 3000 সালের পর ৬৫
3.5 উত্তরাঞ্চলে এবং প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি
(ক্র.) 3000 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পর ৭০
টীকা 3.1 ঃ মরুর 'হারানো নদী' ৭৪
3.2 ঃ ব্যবহৃত পুস্তক সমূহের টীকা ৭৮
নির্ঘণ্ট ৮১

'সারণি, মানচিত্র ও চিত্র

সারণি

1.1 ঃ ভূ-তাত্ত্বিক যুগ ১৭
2.1 ঃ পাথুরে যুগ-দশা, হাতিয়ারের গড়ন, প্রজাতি ৩০
2.2 ঃ প্রাচীন মানুষের কালপঞ্জী ৪৩
3.1 ঃ নব্যপ্রস্তর যুগীয় বিপ্লবের ক্রমপঞ্জী ৭৩

মানচিত্র

1.1 ঃ 2300 লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবী ২
1.2 ঃ 650 লক্ষ বছর আগেকার 'ভারতবর্ষ', ভূ-গাঠনিক পাতের সীমানা সহ ৪
1.3 ঃ ভারতবর্ষ ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ ঃ ভৌত বৈশিষ্ট্য ৬-৭
1.4 ঃ 650 ভারতবর্ষ ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ ঃ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত (সেন্টিমিটারে) ১০-১১
2.1 ঃ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষ ঃ মানব প্রজাতির ছড়িয়ে-পড়া আর হাতিয়ার সংস্কৃতি ৩২-৩৩
2.2 ঃ ভারতবর্ষ ঃ প্রস্তর যুগ সংস্কৃতি নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লবের আগে ছোট ছবি ঃ সোয়ান অববাহিকা ৩৪-৩৫
3.1 ঃ ভারতবর্ষ ঃ নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব ছোট ছবি ঃ বেলান উপত্যকা ৬২-৬৩
3.2 ঃ মরুভূমির নদী ৭৫

চিত্র

2.1 ঃ মানবপ্রজাতির বিবর্তন ঃ পুনর্নির্মিত-জীবাশ্ম করোটি ২২
2.2 ঃ 'ওলডোয়ান' পাথরের হাতিয়ার (ক্র.) 20 লক্ষ বছর আগেকার, সোয়ান অববাহিকা, রিয়াত ২৩

2.3 ঃ পাব্বি পাহাড়ের স্তরকাটা পাথরের হাতিয়ার ২৪
2.4 ঃ সোয়ান অববাহিকার হাত-কুঠার (অ্যাকিউলিয়ান) ২৫
2.5 ঃ 'মাদ্রাজী শিল্প' হাতিয়ার ২৭
2.6 ঃ 'নেভাসা' হাতিয়ার ২৮
2.7 ঃ শোরাপুর দোয়াব থেকে পিঠওয়ালা ছুরির ফলা (কর্ণাটক) ৩২
2.8 ঃ পাকিস্তানের সিংঘাও গুহার শিল্পকৃতি ৩৫
2.9 ঃ মহাদহার মাইক্রোলিথ ৩৮
2.10 ঃ মহাদহা থেকে পাওয়া সমাধিস্থ নারীর করোটি ৩৯
2.11 ঃ 'অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম' ঃ ভীমবেটকা, III C-18/a ৪০
2.12 ঃ বোঝা মাথায় নারী, ভীমবেটকা II F-8 ৪১
2.13 ঃ ময়ূরী, ভীমবেটকা III C-6 ৪২
3.1 ঃ নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার ঃ মসৃণ পাথরের শিল্পকৃতি
মেহরগড় পর্যায় I ৫১
3.2 ঃ 'E-বাড়ী'-র সমমাপ-বিশিষ্ট পুনর্গঠন,
মেহরগড় পর্যায় I ৫৩
3.3 ঃ কৃষিকাজের হাতিয়ার (বিটুমেনে লাগানো কাস্তে-পাথর),
মেহরগড় পর্যায় II ৫৫
3.4 ঃ শিল্পীর সমাধি, মেহরগড়, আবিষ্কৃত হাতিয়ারসমূহ ৫৬
3.5 ঃ টোগু পর্যায়ের মৃৎশিল্প ৬১
3.6 ঃ মনুষ্যাকৃতি মাটির মূর্তি, শেরি খান তারাকাই ৬৫
3.7 ঃ কাদামাটিতে ধানের তুঁষের ছাপ,
চোপনি মাণ্ডো তৃতীয় পর্যায় ৬৭
3.8 ঃ সুতোর ছাপের মৃৎশিল্প, মহাগড় ৬৭
3.9 ঃ পুরুষ হরিণ শিকারে বল্লম আর তীরের ব্যবহার
বুর্জাহোম, পর্যায় IB ৭১
3.1 ঃ খোঁয়াড়ের ছাইগাদায় গবাদি পশুর খুরের ছাপ,
উটনুর ৭২

1

ভারতবর্ষের ভৌত বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের গড়ন

1.1. ভারতবর্ষের ভূ-তাত্ত্বিক গড়ন ঃ

এই যে ইতিহাস অতীতের ইতিবৃত্তকার সে তো পরিবর্তনের কথাকার হবেই। আমাদের চারপাশে দেখি সমস্তই বদলে বদলে যায়। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের জীবনযাপনই কেবল নয়, অবিরত বদলে যাচ্ছে তার চিন্তা, বিশ্বাস, ভাষা, রীতিনীতি সবকিছুই। প্রায় দেড়শ বছর আগে চার্লস ডারউইন দেখিয়েছিলেন যে, নিযুত বছরের পরিক্রমায় সমস্ত প্রজাতি (মানব প্রজাতি সহ) বিবিধ প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে, বিবর্তিত হয়েছে। আর পৃথিবীর উপরিতলও যে কালের সঙ্গে সঙ্গে সবিশেষ বদলে গেছে সে কথা ডারউইনের অনেক আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অবশ্য কাল বলতে মহাকাল— শত নিযুত বছর কিংবা সহস্র নিযুত বছর এইভাবেই ভাবতে হবে।

পৃথিবীর আজকের যে গড়ন সে নিজেই অনেক প্রাচীন, 46,000 লক্ষ বছর আগেকার। পৃথিবীর উপরিতলে সবচেয়ে প্রাচীন শিলার বয়স হলো 39,800 লক্ষ বছর, এ তথ্য আমাদের জানিয়েছে তেজষ্ক্রিয়তা। কাজেই, একেবারে প্রথমযুগের সমুদ্র-শৈবাল আর ব্যাকটেরিয়ার অবয়বে যখন সবেমাত্র প্রাণের ঘুম ভেঙেছিল, সেই 'ভূতাত্ত্বিক কাল'-এ (18 পৃষ্ঠার 1.1 সারণী দ্রষ্টব্য) আর্কিয়ান বা আদি যুগের (40,000 থেকে 25,000 লক্ষ বছর আগেকার) বাসিন্দা ছিল ওরা। প্রাণ যখন বিবিধ বিচিত্র পথে বিকশিত হচ্ছিল, পৃথিবীর উপরিতলের আকৃতি-প্রকৃতির অর্থাৎ ভূত্বকের তখন অবিরাম রূপান্তর ঘটছিল। একটি তত্ত্বানুসারে, এ পৃথিবী সেকালে এমনভাবে আকারে বেড়ে গিয়েছিল (আপন ঘনত্ব কমিয়ে) যে তার আজকের ব্যাস, আদিতে যা ছিলো তার তুলনায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দীর্ঘ হয়ে গেছে। এর অর্থ, 40,000 লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর উপরিভাগের ক্ষেত্রফল এমনি প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়েছে যে এ গ্রহে এসেছে প্রাণ।

আজ যে ভূখণ্ডগুলো একে অপরের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে তারা যে এককালে পরস্পর-লগ্ন ছিল তার অনেক প্রমাণ রয়েছেঃ এদের প্রত্যেকটির শিলায় (তাদের মেরুপথে) প্রত্ন-চৌম্বকত্বের বিন্যাসে যে সাদৃশ্য তা কেবল কোনো এককালে তারা পরস্পর সন্নিহিত থাকলেই সম্ভব, বিশেষত এই তথ্যের আধারেই এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। ভৌগোলিক রূপ-সজ্জার (যেমন, আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে) আধারে এমন একটি প্রাচীনতর সংযুক্তির প্রস্তাবনা রয়েছে পুরোনোকালের তত্ত্ব— 'মহাদেশীয় সঞ্চরণ'-এ। এই তত্ত্বে মনে করা হয় যে, আমাদের আজকের ভারতবর্ষ দক্ষিণ গোলার্ধের 'গণ্ডোয়ানা ভূমি' নামের এক অতি-মহাদেশের (super continent) অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, কুমেরু, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে নিয়ে গড়া এই 'গণ্ডোয়ানাভূম' (মধ্য ভারতবর্ষের গণ্ডোয়ানা শিলার

মানচিত্র 1.1 ঃ 2300 লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবী

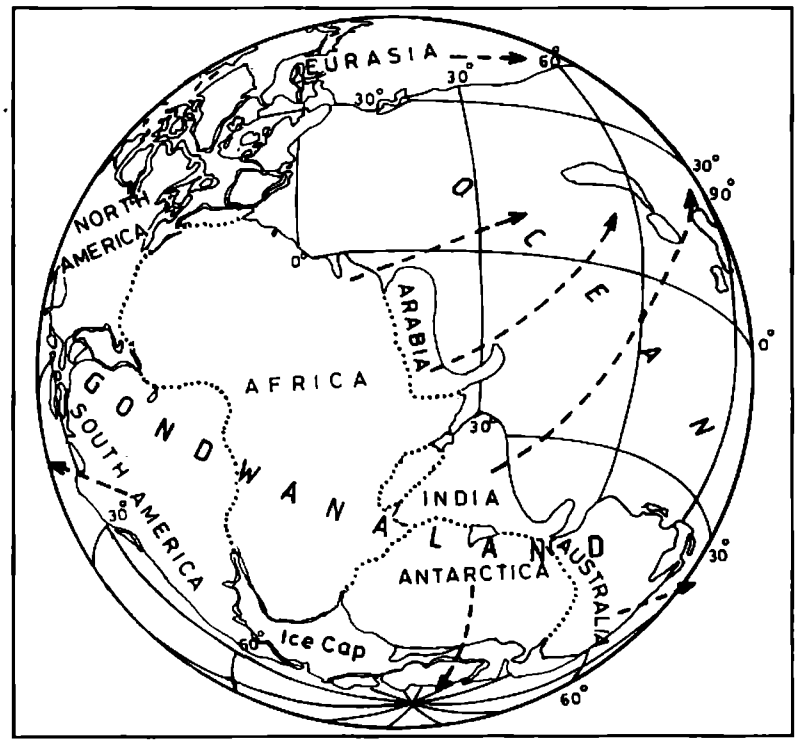

জুরাসিকের (1440 লক্ষ বছর আগে) পর স্থলভাগের চলন নির্দেশিত এইভাবে ঃ ----→
ভারতবর্ষের দীর্ঘ পরিক্রমণ লক্ষ্যণীয়

নামে যার নামকরণ)। ঐসব অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাচীনতর ভৌগোলিক কালের প্রায় সমগোত্রীয় প্রজাতির জীবাশ্মেও (অর্থাৎ পাথরে প্রোথিত প্রাণীদেহের চিহ্ন) এই তত্ত্ব সমর্থিত হয় যে, একদা ভারতবর্ষ ঐ অতি-মহাদেশের অঙ্গীভূত ছিল। জুরাসিক যুগের (1440 লক্ষ বছর আগে) শেষে যখন এই অতি-মহাদেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন অভিমুখে সঞ্চারমান হলো, একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইল, তখন অন্ততপক্ষে অস্ট্রেলিয়া আর অবশিষ্টাংশের মধ্যে সাদৃশ্যের কাল শেষ হয়ে এলো। ইয়োসিন (Eocine) কালের (580 থেকে 370 লক্ষ বছর) কোনো এক সময়ে যে খণ্ডটিতে ভারতবর্ষ আকার ধারণ করেছে, সেটি চলতে শুরু করলো দক্ষিণে, মিলিত হলো ইউরেশিয় মহাদেশের (বর্তমান ইউরোপ এবং এশিয়ায় সিংহভাগ অঞ্চল নিয়ে গঠিত) সঙ্গে (মানচিত্র 1.1 দ্রষ্টব্য)।

এক সুবিশাল ভূ-খণ্ডের এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়া, এই প্রক্রিয়াটির কারণ হিসেবে এখন মহাসাগরতলের প্রসারণকে অংশত দায়ী করা হচ্ছে। সমুদ্র-গভীরের পর্বতশ্রেণীর প্রগাঢ় পর্যবেক্ষণে সূচিত হয়েছে যে, মহাসাগরতল ভূখণ্ডের সঙ্গে অবিরাম সংঘাতে লিপ্ত। ভূ-গাঠনিক পাত (Techtonic plate) তৈরির সঙ্গেও যুক্ত এই প্রক্রিয়া। ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া আর ভারত মহাসাগর— এই তিনে মিলে একটি পাত — ভারতবর্ষীয় পাত — পশ্চিমে আফ্রিকান আর দক্ষিণে ইউরেশিয় পাতকে সে কেবলি ধাক্কা মারছে— এই হলো আমাদের আজকের জ্ঞান। অত্যন্ত নরম, নীচু এক কল্পিত স্তর যাকে বলা হয় অ্যাসথেনোস্ফিয়ার (Asthenosphere) তারই ওপর রাখা এই পাতগুলোর প্রত্যেকটি বারে বারে পিছলে যায়— এই পিছলে-যাওয়াকে আটকে দিতে পারে না অন্য পাতগুলো। একদিকে কেন্দ্রের অভিমুখে 'অভিসারী' চলন আবার অন্যদিকে সে টানের ভারসাম্য রাখতে কেন্দ্র থেকে দূরে যাবার 'অপসারী' অভিপ্রায়— এইভাবে পাতগুলোর পারস্পরিক ঘর্ষণে অবিরাম বদলে বদলে যায় ভূমিরূপ— ঘর্ষণরেখা বরাবর কখনো সে মাথা উঁচিয়ে তোলে আবার কখনো নেমে যায় অতলস্পর্শী খাদে (1.2 মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

এইসব বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে ভূমিরূপ আর সমুদ্রসীমা উভয়ে কেবলি রূপ বদল করে বলেই পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষ তার বর্তমান ভৌত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এমনকি মোটামুটিভাবে কোন্ সময়কালে আত্মপ্রকাশ করল, সেটি প্রতিষ্ঠিত করা বড়ো কঠিন কাজ। কিন্তু প্রত্নজীবীয় (Palaeozoic) যুগের (2480 লক্ষ বছর আগে) শেষে দাক্ষিণাত্য কিংবা ভারতবর্ষীয় উপ-দ্বীপের আকার এখন যেমন তার থেকে অন্তত খুব বেশি আলাদা ছিল না। প্রধানত আর্কিয়ান বা আদিকালে গঠিত শিলায় প্রস্তুত এর ভিত্তিভূমি। আর এতেই পৃথিবীপৃষ্ঠে ভারতবর্ষীয় উপদ্বীপ হয়ে উঠেছে প্রাচীনতম এবং ভৌগোলিকভাবে সবচেয়ে সুস্থিত খণ্ড। বস্তুত লম্বালম্বিভাবে উত্তুরে কোণে চলৎশক্তিহীন আরাবল্লীকে বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো এখনো বেঁচে থাকা পর্বতশ্রেণীর

মানচিত্র 1.2 ঃ 650 লক্ষ বছর আগেকার 'ভারতবর্ষ', ভূ-গাঠনিক পাতের সীমানা সহ

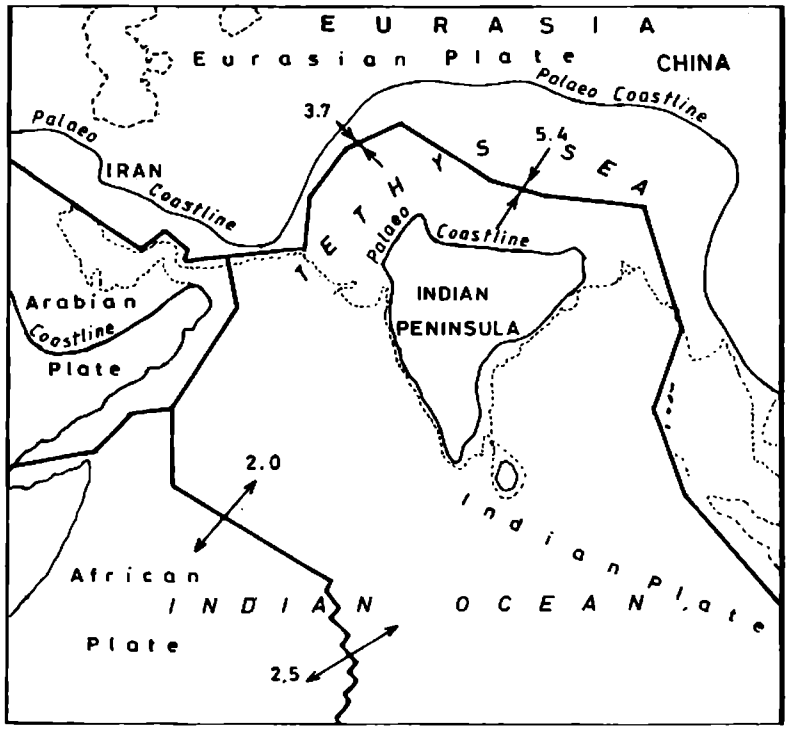

একটি বলে মনে করা হয়। আগেকার দাক্ষিণাত্য-শিলায় জীবাশ্মের কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু কার্বোনিফেরাস (Carboniferous) কালের (3200 লক্ষ বছর থেকে 2860 লক্ষ বছর) গণ্ডোয়ানা শিলায় স্থলজ প্রাণের জীবাশ্ম রয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, প্রায় 3000 লক্ষ বছর আগেই দাক্ষিণাত্য সমুদ্র-শাসন-মুক্ত এক স্বাধীন ভূখণ্ড হয়ে উঠেছে। প্রায় 980 লক্ষ বছর অর্থাৎ নিম্ন ক্রেটাসিয়াস (Cretaceous) কাল শেষ হবার আগেই গন্ডোয়ানা শিলায় ডাইনোসর অথবা অতিকায় সরীসৃপদের জীবাশ্ম-চিহ্ন পড়েছে।

হিমালয় পর্বতমালায় এবং লবণাক্ত অঞ্চলে, সামুদ্রিক প্রাণের জীবাশ্মবাহী শিলাখণ্ড ক্যামব্রিয়ান (Cambrian) কালের (5700 লক্ষ বছর পূর্বের সময়কাল অবধি) সাক্ষর বহন করে। এতে বোঝা যায় যে সামুদ্রিক পলি থেকেই শিলাগুলির বিকাশ এবং আজ যেখানে হিমালয় পর্বতমালা কোন এককালে সেখানে ছিল উত্তাল সমুদ্র। ভূতাত্ত্বিকরা

ভূমধ্যসাগর থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত যে টেথিস সাগরের কথা বলেন, হতে পারে এটি তারই একটা অংশ। মধ্যজীবীয় (Mesozoic) যুগের (এটিও 650 লক্ষ বছর আগের সময়কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত) শেষ পর্যন্ত সামুদ্রিক জীবাশ্মের চিহ্ন মিলেছে হিমালয়ে আর 2130-1440 লক্ষ বছর আগের সময় অবধি জুরাসিক সময়ের সামুদ্রিক জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে পশ্চিম রাজস্থানে আর কচ্ছে। কাজেই, ঐ অঞ্চলটি অবশ্যই একদিন সমুদ্রের অতলে তলিয়ে ছিল।

ক্রেটাসিয়াস কালে (1440 থেকে 650 লক্ষ বছর আগে) দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং গুজরাট ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতে শিহরিত হয়েছে আর তারই পরিণতিতে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি অঞ্চল ঢেকে গেছে গলিত লাভাস্রোত আর ভস্মস্তূপে— যাকে বলা হয় 'দাক্ষিণাত্য ফাঁদ' (Deecan Trap)। টার্সিয়ারি (Tertiary) কালের প্রারম্ভকাল থেকে (650 লক্ষ বছর আগে), বিশেষত ইয়োসিন কালে মাথা তুলতে শুরু করল আমাদের হিমালয়, গুরুত্বপূর্ণ সে উত্থান বজায় রইলো মায়োসিন (Miocine) কালেও (250 লক্ষ থেকে 50 লক্ষ বছর পর্যন্ত)। মায়োসিন কালে নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হলো আদিমতম বানর। অনুমান করা হয় যে, ইউরেশিয় পাতের ওপর ভারতীয় পাতের চাপে যে প্রচণ্ড ভাঁজের সৃষ্টি হলো, তাতেই জেগে উঠলো হিমালয় আর তৎসংলগ্ন পর্বতমালার সুদীর্ঘ সারি।

হিমালয় থেকে বিপুল পরিমাণ ভগ্ন শিলা আর পলি অসংখ্য হিমবাহ আর নদীতে বাহিত হলো, হিমালয়েরই পাদদেশে গড়ে তুললো শিবালিক পর্বতমালা। সম্ভবত দশ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত চলেছিল দ্বিতীয় স্তরের পর্বত গঠনের এই প্রক্রিয়া। ঐ একই সময়কালে, হিমালয়ের জলবাহিকাগুলির মাধ্যমে শিবালিকের নীচে নিরবচ্ছিন্নভাবে এতো পলির স্তূপ জমছিল যে, প্লেস্টোসিন (Pleistocene) কালের (18 লক্ষ থেকে দশ হাজার বছর আগে) মধ্যেই বিশাল টেথিস সাগর, নাব্যতা যার 2000 থেকে 6000 মিটার, সেটি ভরাট হয়ে গেলো আর সেখানে গড়ে উঠলো সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সুবিশাল পলি-অববাহিকা।

1.2 মানব অভ্যুদয়ের কাল থেকে প্রাকৃতিক ভারতবর্ষ ঃ

প্লেস্টোসিন ভূ-তাত্ত্বিক কালের সূচনাপর্বের ঠিক আগে, প্রায় 20 লক্ষ বছর পূর্বে আদিমতম মানব (হোমো হাবিলিস বা হোমো ইরেক্টাস) আবির্ভূত হলো লবণাক্ত অঞ্চলে (পাকিস্তান) আর শিবালিক পর্বতমালায় (ভারত)। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক চেহারা তখন অনেকটা এখনকার মতোই ছিলো, তবে কয়েকটি গঠন-প্রক্রিয়া, যেমন শিবালিকে শিলা সঞ্চয়, এগুলো তখনো ঘটমান, তাছাড়া প্লেস্টোসিন কালে অন্য অনেক বদলও ঘটছিল। হিমায়নের (তুষার যুগ) পুনরাবৃত্ত দশা, যেগুলো প্রায় 20 লক্ষ বছরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাতে ভারতবর্ষের তুলনায় পৃথিবীর অন্যান্য অংশের বেশি

মানচিত্র 1.3
ভারতবর্ষ ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ ঃ
ভৌত বৈশিষ্ট্য

ক্ষতি হয়েছিল। আজকে সমুদ্রতলের 4000 মিটার ওপর থেকে বরফঢাকা হিমালয় দেখি, কিন্তু সমুদ্রতলের 1800 মিটার ওপর থেকেই তখন দেখা যেতো তুষার-রেখা। আগে যেসব নদীকে হিমালয়ের হিমবাহগুলো পুষ্ট করেছিল, তাদের উপরের অংশগুলোকে দখল করে হিমাঞ্চল নেমে এসেছিল সমুদ্রতলের মাত্র 1400 মিটার ওপরে। এই সূত্রগুলো এখন পাওয়া গেছে হিমবাহ-আনীত শিলা ও মৃত্তিকা-সঞ্চয়ে কিংবা প্রান্তিক গ্রাবরেখায় (moraine)। পাথুরে বাধা সরিয়ে, গভীর খাদ কেটে, এমনকি পাহাড় মসৃণ করে এরকম নানাভাবে হিমবাহগুলো প্রাকৃতিক সমোন্নতি রেখা (contours) বদলে বদলে নিজেদের পদচিহ্ন রেখে গেছে।

উত্তর-পশ্চিম ইওরোপে এবং উত্তর আমেরিকায় বিপুল জলরাশি বিশালাকার হিম-চাদরে পরিণত হওয়ায়, সারা পৃথিবীর মতো ভারতবর্ষেও প্রতিটি তুষার-যুগে হিমায়নের একটা প্রধান ফসল হিসেবে সমুদ্রতল অনেক অনেকখানি নীচে নেমে গেলো। পরবর্তীকালের প্লেস্টোসিন কালের শেষভাগে সর্বশেষ তুষার-যুগে, সমুদ্রতল বর্তমানের গড় তলের চেয়ে 100 থেকে 150 মিটারের মতো নীচু ছিলো বলে অনুমান করা হয়। তুষারযুগে সমুদ্রতলের এরকম নেমে যাওয়ার অর্থ ঃ কচ্ছ ও ক্যামবে উপসাগরে শুষ্ক ভূমি বিস্তৃত হলো; আদম সেতুর চতুর্দিকে প্রসারিত এক ভূ-বলয়ে শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলো; উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ আন্দামান একটিমাত্র দ্বীপের রূপ পেল। এমন এক ভূখণ্ড-সেতুর দৌলতে হোমিনিড এবং আমাদের নিজেদের প্রজাতির প্রথম সদস্যেরা এখনকার অসংখ্য বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জের এলাকাতেও পৌঁছানোর ছাড়পত্র পেল। অবশ্য অসংখ্য হিম-বিরতি কালে উষ্ণতার পুনরাগমন ঘটতেই, হারানো ভূমির ওপর আবার নিজ অধিকারের দাবি জানাতে সমুদ্র মাথা তুললো। দশ হাজার বছর আগে, সেই হলোসিন (Holocene)-এ অর্থাৎ আমাদের বর্তমান যুগ শুরু হবার পূর্বে সমুদ্র ঐ একইরকম খেল দেখিয়েছিল। কেবলমাত্র বিশাল নদী-বদ্বীপে সমুদ্র তটরেখা পরবর্তীকালের প্রতিটি হিমবিরতি সময়ে স্থলভাগের দিকে অনেক কম এগিয়ে এসেছিল। বিশেষ উষ্ণ হিমবিরতি কালপর্বে সমুদ্রতল এমনকি তার বর্তমান উচ্চতার চেয়ে আরো বেশি উপরে উঠে থাকতে পারে। প্রবাল-স্তূপের গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রায় 1,20,000 বছর আগে আর তারপর আরেকবার 30,000 বছর আগে সমুদ্রতল উচ্চতর হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে যে হিমবিরতি-কাল চলছে, সেই হলোসিনের সময়ে 5000 বছর বা ঐরকম কিছু আগে, সমুদ্রতল এখনকার অবস্থানের তিন মিটার উঁচুতে উঠেছিল। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে কচ্ছের রান একটা মরসুমী অগভীর সামুদ্রিক খাড়ির মতো হয়ে থাকতে পারে।

হিম-চাদর আর সমুদ্র-উপকূল বারবার বদল হওয়া সত্ত্বেও, প্লেস্টোসিনে যে তিনটি প্রধান অঞ্চল জুড়ে ভারতবর্ষ তৈরি হলো, তারা কিন্তু আজ যেখানে আছে, ঠিক ঐ একই অক্ষাংশে, প্রায় একই সীমারেখায় ও উষ্ণতায় আটকা পড়েছিল সেদিন থেকেই।

এই অঞ্চলগুলো হচ্ছে ঃ

১) দাক্ষিণাত্য অথবা উপদ্বীপ এলাকা অনেক দিন আগেই এখনকার মতো আকার পেয়ে গেছে। উঁচু কোণাটা তার পশ্চিমে আর মালভূমির দিকটা ঢালু হয়ে পুবমুখে নেমে গেছে।

২) হিমালয় থেকে নদীবাহিত বালি আর কাদায় উত্তরের সমভূমি তৈরি হয়েছে। উত্তর-পূর্ব বরাবর আরাবল্লী পর্বতমালার উত্তুঙ্গ পাহাড়চূড়া এই সমভূমিকে দুটি প্রাকৃতিক অংশে ভাগ করেছে। যথা— সিন্ধু এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা।

৩) উত্তর দিকেই পুরোপুরি বিস্তৃত হিমালয় তার লাগোয়া আরো পর্বতশ্রেণী সমেত পূর্বে আর পশ্চিমে সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে।

তবুও (18 লক্ষ বছর আগে) প্লেস্টোসিন-এর প্রত্যুষে আর হিম-যুগের আগে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক মানচিত্র আজকের চেয়ে অনেকটাই আলাদা ছিল। উত্তরের সমভূমিতে নদীগুলো তখন যেভাবে প্রবাহিত ছিলো, এই একটা কারণেই এরকম পার্থক্য অনেকটা বেশি হওয়া সম্ভব। বস্তুত, একবার তো এরকম যুক্তিও দেওয়া হলো যে, শাখানদী উপনদী সমেত আজকের যে দুটো প্রধান নদী, সিন্ধু আর গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র, তাদের বদলে তখন একটাই নদী ছিল, 'ইন্দো-ব্রহম' কিংবা 'শিবালিক' নদী। সে নদী হিমালয়ের গা বেয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে তারপর দক্ষিণে বেঁকে আরব সাগরে পড়েছিল। এরকম তত্ত্ব অবশ্য বেশিদিন টেকেনি। কিন্তু এর একটা কথা অন্তত ঠিক যে, একসময় হয় যমুনা সিন্ধুর মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতো কিংবা শতদ্রু বইতো যমুনার বুকে। এর একেবারে সহজ সরল প্রমাণ হলো যে, একই প্রজাতির ডলফিন সিন্ধু আর গঙ্গা দু'নদীতেই দেখতে পাওয়া যায়। গত 10 লক্ষ বছরের মধ্যে কখনো প্রধান উপনদীর একটা যদি গঙ্গা থেকে সিন্ধুর মধ্যে সরে যায় কিংবা তার বিপরীত কিছু হয়, তবেই এমনটা ঘটতে পারে।

আমরা এখন যে ভূতাত্ত্বিক কালে বাস করছি তার নাম হলোসিন (Holocene)। প্লেস্টোসিন (Pleistocene) হিমীভবন শেষ হবার পর 10,000 বছর বা ওরই কাছাকাছি সময়ের আগে এটা শুরু হয়েছিল। ঐ সময়কালে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক মানচিত্র (মানচিত্র 1.3) বেশ স্থিতিশীল হয়ে গিয়েছিল। কিছু কিছু বদল ঘটেছিল প্রাকৃতিক সমোন্নতি রেখায় (গড় সমুদ্রতলের উপরে একই উচ্চতা-রেখাগুলি); সামুদ্রিক উপকূলভাগে আর শাখানদী উপনদীসহ নদী প্রবাহে তার মাত্রা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। এর মধ্যে মানুষের আপন হাতের চিহ্ন যেখানে যেখানে রয়েছে, যেমন সেচের ধাক্কায় নদী প্রবাহ শুকিয়ে যাওয়া, কিংবা বাঁধ আর পরিখায় স্থলভাগে বড়ো বড়ো হ্রদ তৈরি করা কিংবা পাহাড় কাটা বা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া, এসব যদি মনে না রাখি, তাহলে বলতে হবে যে, স্থলভাগের চেহারা বদলের প্রধান কারণ ছিল ভূমিকম্প। প্রধানত ভূ-গাঠনিক (techtonic) পাতগুলোর পরস্পরের সংঘর্ষে উৎপন্ন বিপুল

পরিমাণ ঘর্ষণবলের যে চাপ, এই ভূমিকম্প তারই অবদান। এমনই এক সারি চ্যুতি রেখা (fault-line) বরাবর রয়েছে আমাদের হিমালয় আর যে ভূ-গাঠনিক আন্দোলন তাদের ঠেলে তুলেছে তার কাজ এখনো অব্যাহত। এমনকি 1897 সালে আসামের ভূকম্পন পাহাড়গুলোর উচ্চতা আর আপেক্ষিক অবস্থান পাল্টে দিয়েছিল। ঐ অঞ্চলে 1950-এর ভূকম্পনেও একই ফল দেখা গেলো। গুজরাটের কচ্ছে 1819 সালের ভূকম্পনে রাণের একটা অংশ নেমে গিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে 3 থেকে 5.5 মিটার উঁচু আর 80 কিলোমিটার লম্বা একটা অদ্ভুত পরিখা (আলা বাঁধ) জেগে উঠেছিল। এই একই অঞ্চলে 2001 সালের জানুয়ারীর সাম্প্রতিক ভূকম্পন আবার রাণের বিভিন্ন অংশের ভূমিস্তরে পরিবর্তন এনেছে।

সমুদ্র উপকূলরেখায় সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন ঘটেছে হলোসিন-এর সময় ঃ সমুদ্র অবিরত স্থলভাগকে চাপ দেওয়ায় ফলেই ভূভাগ এইভাবে সমুদ্রগর্ভে যায়। সমুদ্রতলের নীচে 4 মিটার পর্যন্ত ডুবে-থাকা গাছ পাওয়া গেছে, আর এই গভীরতা মুম্বাই দ্বীপের নিম্ন জলস্তরের চেয়েও নীচে; সিন্ধু সভ্যতার নিমজ্জিত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে যে দ্বারকায়, সেখানেও সৌরাষ্ট্র তটভূমির উত্তর-পশ্চিম অগ্রভাগে স্থলভাগের 'তলিয়ে-যাওয়া'র ঘটনা ঘটেছে। বালি আর শিলা ছড়ানো নদীগুলোর বদ্বীপ এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের অভিমুখে, অবশ্য কোনো নিয়মিত রীতিতে কিংবা অনুরূপ বাতাগ্র (front) বরাবর নয়। প্রধান প্রধান নদীগুলোর সঞ্চয়-কাজের জন্য ভূভাগ যেখানে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে আবার একই সঙ্গে অন্য কোথাও বালি-শিলার পুরোনো সঞ্চয় সমুদ্র দখল করে নিচ্ছিল। বাংলাদেশে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপের, এক বছরে তৈরি করা দ্বীপগুলোর মানচিত্র পরের বছর ঠিক বলে দাঁড় করানো অসম্ভব। তবু সাধারণভাবে, এমনকি বড়ো বড়ো নদীগুলোর বদ্বীপে সামুদ্রিক তটরেখা এগিয়ে আসার যে গতির কথা অনুমান করেছেন কয়েকজন মানচিত্র-নির্মাতা, (যেমন Schwartberg), আসলে সেটা অতোটা বেশি ছিল না। যেমন, সিন্ধুনদের মোহানা বরাবর 4000 বছরে তীরভূমির 40 থেকে 60 কিলোমিটারের বেশি এগিয়ে আসাকে নস্যাৎ করে দিল সিন্ধু সভ্যতার দুটি ক্ষেত্র— থারো আর কুঞ্জ শোর; প্রকৃত অগ্রগতির পরিমাণ অবশ্যই খুব কম ছিল।

নদীগুলোর ক্ষেত্রে, পর্বতে আর পার্বত্য উপত্যকায় খুবই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তাদের গতিপথ নির্দিষ্ট। উত্তর ভারতের পলল-সমভূমিতেও হলোসিন সময়ে নদীর গতিপথের অদল-বদল বরং সীমাবদ্ধ ছিল। সিন্ধুর একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে— পূর্বে লবণাক্ত এলাকা (salt range) থেকে পশ্চিমে সুলাইম্যান পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত। একইরকমভাবে, গঙ্গা আর যমুনা তাদের উচ্চ গতিপথে নিজেরাই চতুর্দিকের সমভূমির নীচে, এমন গভীর খাত কেটেছিল যে, এখন তারা যে পথে চলেছে, গত দশ হাজার বছরে কিংবা আরো বেশি সময়কালের মধ্যে তাদের অন্য কোনো দিকে প্রবাহিত হবার

কথা ভাবা অসম্ভব। সাধারণভাবে বলতে গেলে, সমোন্নতি রেখার ওপরে কখনো নদী প্রবাহিত হতে পারে না কিংবা বর্তমান প্রবাহ-রেখাকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করতে পারে না — ছোট ছোট নদী-নালার প্রবাহের গতিপথে এটাই দেখা যায়। তবুও সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির কয়েকটি নদীর গতিপথ গত শতাব্দীতে আমূল বদলে গেছে বলে জানা যায়। মুলতানের পূর্বদিকে বইতো রবি, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর কিছু আগে, সেটি মুলতানের দক্ষিণে সোজা চেনাবে গিয়ে পড়লো, এখনো সেভাবেই বয়ে চলেছে। শতদ্রুর সঙ্গে মিলিত হবার পর বিপাশা আবার আলাদা হয়ে আরো অনেকটা উত্তরে বইছিল, এই সেদিন সপ্তদশ শতাব্দীতে ঐ খাত পরিত্যক্ত হল। বিহারের কুশী বিশাল এলাকা জুড়ে বারবার তার খাত বদল করার জন্যে কুখ্যাত। বাংলায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিস্তা গঙ্গার সঙ্গ ত্যাগ করে সরাসরি ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হল আর ব্রহ্মপুত্র পরিত্যাগ করল তার প্রধান খাতভূমির বিশাল পূর্বমুখী বাঁক (এখনো তার নাম একই আছে), তারপর প্রায় অনেকটা দক্ষিণে গিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হল।

দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপে, সাধারণত মালভূমির নদী-উপত্যকাগুলো সরু আর লম্বা। সেজন্যে একেবারে সমুদ্রতটে পৌঁছোবার পরেই তাদের স্রোতধারায় একটু আধটু বদল ঘটা সম্ভব হয়েছে। কাবেরী একটা দীর্ঘ স্থিতিশীল পথে চলার পর তিরুচিরাপল্লীর কাছে দুটি ধারায় ভাগ হয়ে যায়; তার মধ্যে কোলেরুন এখন প্রধান নদী হিসেবে চিহ্নিত, কিন্তু পুরোনো নাম বয়ে বেড়ানো স্রোতটিই সম্ভবত আগে নদীর প্রধান খাতভূমি (bed) ছিল।

1.3 জলবায়ু ঃ

আমরা দেখেছি, যখন 'মহাদেশীয় সঞ্চরণ' থেমে গিয়েছিল আর ভারতবর্ষের প্রধান ভূমিরূপটি গঠিত হয়েছিল, তখন প্লেস্টোসিন কালারম্ভের পূর্বে, প্রায় 200 লক্ষ বছর কিংবা ঐরকম কিছু আগে ভারতবর্ষ বর্তমানে অক্ষাংশের যে ডিগ্রীতে রয়েছে, ইতিমধ্যেই সেই অবস্থানে স্থিত হয়েছে। নিরক্ষরেখা (অথবা সবচেয়ে লম্বা অক্ষাংশ-রেখা গঠন করে যে 0^{o} অক্ষাংশ) আর দুটি মেরুর (90^{o} উত্তর, 90^{o} দক্ষিণ— যারা শুধু দুটি বিন্দু) মধ্যে যে ভূমি (space), তাকে ভাগ করেছে যে সমান্তরাল রেখাগুলো তাদের বলে অক্ষাংশ। যেহেতু মেরু দুটির কাছাকাছি অবস্থিত ক্ষেত্রের তুলনায় নিরক্ষরেখার কাছাকাছি থাকা ঐ একই পরিমাণ ক্ষেত্র অনেক বেশি সূর্যালোক পায়, সেকারণে কোনো অঞ্চলের অক্ষাংশের ডিগ্রীর মান যতো কম, যত বেশি সেটি নিরক্ষরেখার কাছাকাছি ততই সে অঞ্চল উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি থাকা বেশি ডিগ্রীর অক্ষাংশ অঞ্চলগুলোর চেয়ে অনেক বেশি উষ্ণ হবে। ভারতবর্ষের প্রধান ভূ-ক্ষেত্র 8^{o} উত্তর অক্ষাংশ থেকে 37^{o} উত্তর অক্ষাংশের একটু ওপরে অবস্থিত। মোটামুটি নিম্ন-অক্ষাংশ অঞ্চল হবার জন্য এর জলবায়ু প্রধানত উষ্ণ (গ্রীষ্মমণ্ডল)। এই

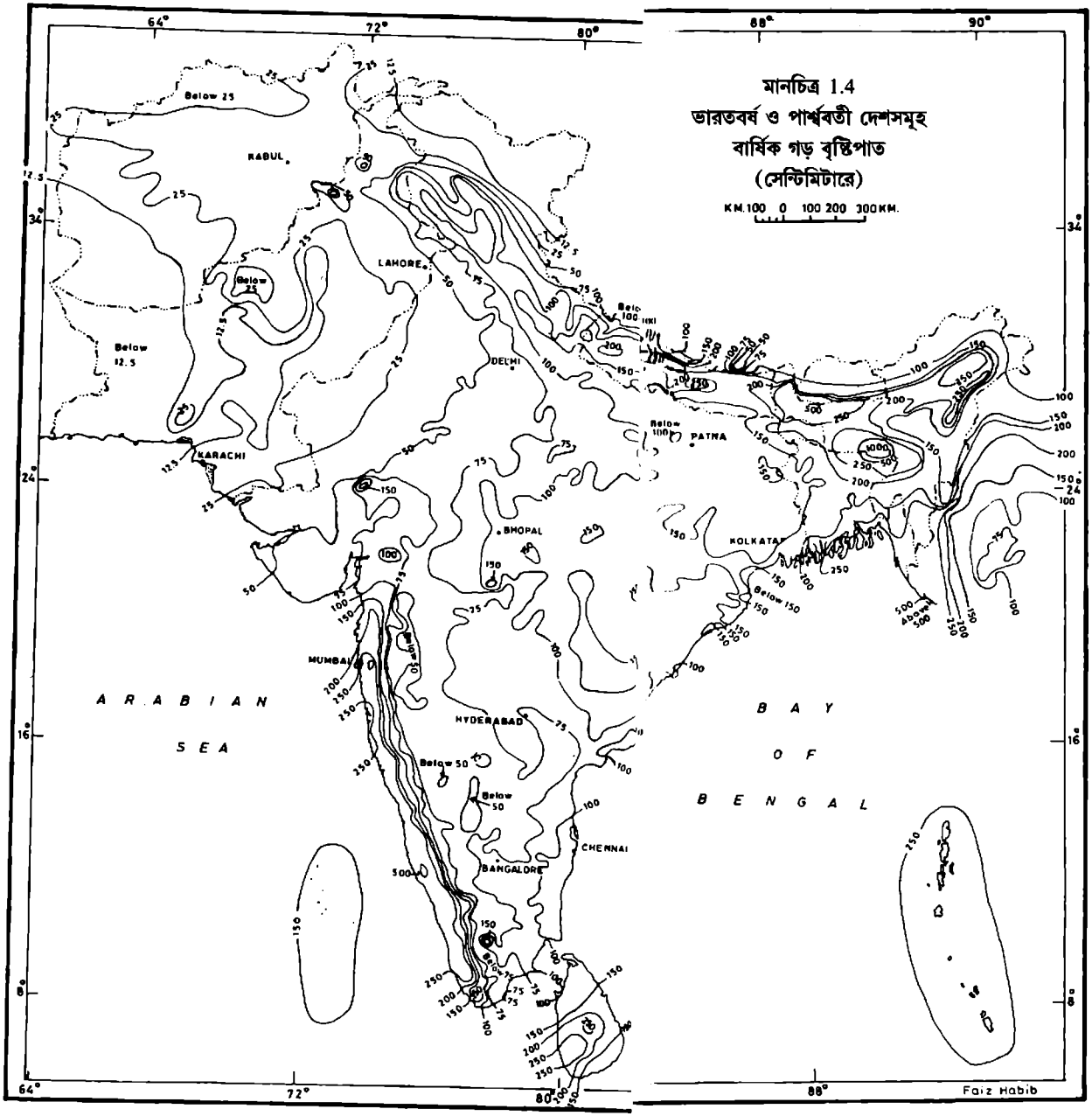
মানচিত্র 1.4
ভারতবর্ষ ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত
(সেন্টিমিটারে)
KM. 100 0 100 200 300 KM.
64°
72°
80°
88°
90°
34°
24°
16°
8°
KABUL
LAHORE
DELHI
PATNA
KOLKATA
KARACHI
BHOPAL
MUMBAI
HYDERABAD
CHENNAI
BANGALORE
A R A B I A N
S E A
B A Y
O F
B E N G A L
Below 25
Below 12.5
Below 50
Below 100
Below 150
Faiz Habib

কারণেই প্লেস্টোসিন হিম সময়ে বিশাল বিশাল হিম-চাদর (Ice-sheet) আর হিমবাহ কেবল হিমালয়েই বন্দী ছিল আর সেজন্য সেই আদিম মানুষের পক্ষেও ভারতবর্ষের বুকে পা রাখা কিংবা এখানে ঘর বাঁধা সম্ভবত অনেক সহজ হয়েছিল।

যে কোনো অঞ্চলে, সর্বব্যাপ্ত যে তাপমাত্রা তা বদলে-বদলে যাবার দ্বিতীয় কারণ হল সে অঞ্চলের উচ্চতা, অথবা গড় সমুদ্রতলের (অর্থাৎ শেষ স্থান সমুদ্রতলের কতো মিটার ওপরে এইভাবে উচ্চতার পাঠ নেওয়া হয়) তুলনায় তার আপেক্ষিক উচ্চতা পরিমাপ করা হয়। স্থানটি যত উঁচু, বাতাস তত পাতলা, তাই তাপমাত্রা তত কম। হিমালয় এবং কারাকোরামের সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ আর সেজন্যে দুটো মেরু প্রদেশ বাদ দিলে, তাদের মাথাতেই অত বিশালাকার স্থায়ী বরফের চাদর; এই সুবিশাল পর্বতাঞ্চলে সেই অনুসারে জলবায়ু অনেক বেশি শীতল (আল্পীয়)। দক্ষিণের উপদ্বীপ-অঞ্চলেও, উঁচু উঁচু পাহাড় আর মালভূমিক থাকায় নিম্নভূমি অঞ্চলের তুলনায় সে অঞ্চল বেশ একটু ঠাণ্ডা।

যে বিশাল ভূ-তাত্ত্বিক চাপে হিমালয়কে ঠেলে তোলা হয়েছিল, ভারতবর্ষের বাকি অংশ উষ্ণতর করার ক্ষেত্রে তারও কিছু অবদান ছিল। কেননা, উত্তরের শীতলতর অঞ্চল থেকে আসা দক্ষিণমুখী বাতাসের গতিপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের হিমালয়। সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির সঙ্গে একই অক্ষাংশে অবস্থিত আমেরিকার সমভূমির তুলনায় দেখা গেছে যে, হিমালয়ের এ প্রাচীর ভারতবর্ষের সমভূমিকে 1.5^{o} থেকে 3^{o} সেলসিয়াস পর্যন্ত উষ্ণ করে তুলেছে।

দক্ষিণের উপদ্বীপের দু'পাশে এই যে বিশাল সামুদ্রিক বিস্তৃতি, পশ্চিমে আরব সাগর আর পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দাক্ষিণাত্যের জলবায়ু মাঝামাঝি উষ্ণতায় রাখতে এটি প্রভূত সাহায্য করে। স্থলভাগের বৈসাদৃশ্যে, সমুদ্র খুব ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়, শীতল হতেও অনেক সময় লাগে। যার ফলে সমুদ্র থেকে দূরবর্তী স্থলভাগের তাপমাত্রা যত বেশি ওঠানামা করে, সমুদ্রের খুব কাছাকাছি থাকলে তেমনটি হতে পারে না। তার ওপর, স্থলভাগ উত্তপ্ত হলে তপ্ত বায়ু ওপরে উঠে যায়, আর সমুদ্র থেকে বয়ে আসা অপেক্ষাকৃত শীতল বাতাস নীচের বায়ুমণ্ডলকে শীতল করে। সেজন্য ভারতবর্ষের উত্তরাংশে যেমনটি ঘটে দক্ষিণের উপদ্বীপে কখনো তা হয় না, সেখানে কখনো তাপমাত্রার প্রচণ্ডতা দেখা যায় না।

তাপমাত্রা ছাড়া জলবায়ুর আরেকটি প্রধান উপাদান হলো বৃষ্টিপাত — কিংবা বরং বলা যায় 'অধঃক্ষেপণ' (Precipitation)— যার মধ্যে বৃষ্টি, কুয়াশা, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, বরফ-ঝড় সবকিছু মাধ্যমে জলকণার যে সঞ্চয় তাকে ধরা হয়। ভারতবর্ষের স্থলভাগের ওপর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের ওপর তাপমাত্রা যেমন যেমন থাকে, প্রধানত তারই ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বৃষ্টিপাত-অঞ্চল নির্ধারিত হয়। এর কারণ হলো, ভারতবর্ষের পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকে, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হিমালয় এবং অন্যান্য

পর্বতশ্রেণীগুলি একত্রে স্থলভাগের বায়ুপ্রবাহকে আড়াআড়িভাবে তাদের ডিঙিয়ে যেতে দেয় না। সেজন্য গ্রীষ্মকালে যখন উত্তরের সমভূমি এবং দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপ উত্তপ্ত হয়, তখন এশিয়ার স্থলভাগ থেকে ভারতবর্ষের অভিমুখে বায়ু প্রবাহিত হয় না, কিন্তু শীতলতর আর্দ্র বাতাস — দক্ষিণ-পূর্ব 'মৌসুমী বায়ু'— আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে বইতে শুরু করে। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা মৌসুমী বায়ু পুবদিকের পাহাড়ী বাধা এবং হিমালয়ে ধাক্কা খেয়ে পশ্চিমে বাঁক নেয়, তারপর সমতলের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। পশ্চিমের দিকে যতই চলে, ততই সে বায়ুস্রোত দুর্বল হয় আর তাই উত্তর-পশ্চিম বরাবর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আচমকা কমে যায়। এই বৃষ্টিপাত কমে যাওয়াই রাজস্থান আর সিন্ধু প্রদেশের থর মরুভূমি সৃষ্টির জন্য দায়ী। শীতকালে আবার বায়ুপ্রবাহের অভিমুখ উল্টে যায়, কেননা তখন শীতল স্থলভাগ থেকে বাতাস (ফিরতি মৌসুমীবায়ু) সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বাতাস স্থানীয়ভাবে অর্থাৎ ভূমি-জলের (surface water) বাষ্পীভবনে বৃষ্টি আনে আর সে কারণে শীতকালে অতো প্রবল বর্ষণ হয় না। অবশ্য অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু আর শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে, যেখানে শীতকালীন মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে নিয়ে আসা জলকণায় ভারি হয়ে থাকে, সেখানকার জন্য একথাটি সত্যি নয় (বৃষ্টিপতনের বণ্টন বুঝতে গেলে 1.4 নং মানচিত্র দেখতে হবে)।

প্লেস্টোসিনের অনেক কাল আগেই এই বিশাল পার্বত্য প্রাচীর গড়ে উঠেছিল এ তথ্য জানা থাকায়, আজকে আমরা যে অঞ্চলকে মৌসুমী সাম্রাজ্য বলে জানি সেটা যে খুব কম করেও কুড়ি লক্ষ বছরের পুরোনো, সে বিষয়ে সামান্য সন্দেহের অবকাশও থাকতে পারে না। হিমযুগগুলির সময়কালে সমুদ্র যেহেতু পিছু হটেছিল, তাই বৃষ্টিপাত অবশ্যই লক্ষণীয় মাত্রায় কমে গিয়েছিল, অন্যদিকে হিমবিরতি কাল সময়ে যেমন, আমরা এখন যে কালে বাস করছি সেই প্লেস্টোসিনে নিশ্চয়ই বেড়েছিল বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

এখন হলোসিন কালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বদলেছিল কিনা সে নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। রাজস্থানের হ্রদের তলভূমি পরীক্ষা করে অনেকে এই মত প্রকাশ করেন যে, এক বা দু'হাজার বা তারও বেশি সময় ধরে একটানা পর্যায়ক্রমে 'শুষ্ক' এবং 'আর্দ্র' সময়কাল দেখা গিয়েছিল। এর বিপরীত ভাবনায় অন্যদের যুক্তি হলো, বছর বছর মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালীপনা ছাড়া একে আর কিছুই বলা যায় না। যাই হোক বন কেটে ফেলা, প্রাকৃতিক উদ্ভিদের বিনষ্টির বিনিময়ে কৃষিকাজের প্রসারণ ঘটানো, এসব কারণেই গত দুই কি তিন হাজার বছর ধরে সম্ভবত বৃষ্টিপাত কমে গেছে বলে মনে হয়। যেহেতু স্থায়ী উদ্ভিদ আস্তরণের অপসারণে ভূমির জল-ধারণ-ক্ষমতা কমে যায়, ফলে কমে যায় স্থানীয় ভিত্তিতে উৎপন্ন 'অধঃক্ষেপণ', তাই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের অনুপ্রবেশই প্রধানত পরিবেশের এমন বদল ঘটিয়েছে।

1.4 প্রাকৃতিক উদ্ভিদ এবং বন্য প্রাণী ঃ

40,000 লক্ষ থেকে 25,000 লক্ষ বছর বা ঐ রকম কিছু আগে, আর্কিয়ান বা আদি যুগে অ্যালগি আর আদি ব্যাকটেরিয়া রূপে পৃথিবীতে জীবন আবির্ভূত হয়েছিল। ক্যামব্রিয়ান কালে (5,700 লক্ষ বছর আগে যার সূচনা) বিকশিত হয়েছিল সামুদ্রিক প্রাণী। 4380-4080 লক্ষ বছর আগের সিলুরিয়ান (silurian) শিলায় আদি যুগের স্থলজ উদ্ভিদ আর কীটপতঙ্গের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। কিন্তু এই উদ্ভিদগুলো একেবারে আদ্দিকালের। এমনকি দেভোনিয়ান (Devonian) সময়কালেই (4080 লক্ষ থেকে 3600 লক্ষ বছর আগে) সবেমাত্র ফার্ণ আর মসের দেখা মিলল আর নিম্ন ক্রেটাসিয়াস কালে (1440 লক্ষ বছর আগের সময়ের সূচনাপর্বে) এল সপুষ্পক উদ্ভিদ। ভারতবর্ষের নিম্ন গণ্ডোয়ানা শিলায় পাওয়া যায় ফার্ণের জীবাশ্ম আর উচ্চ গণ্ডোয়ানায় সরলবর্গীয় বৃক্ষের জীবাশ্ম। 550 থেকে 380 লক্ষ বছর আগে, দেখা দিল প্রাচীন ঘাস। বৃক্ষ, জঙ্গল, গুল্ম এবং ঘাস— এই যে নানান আকারে আজ আমরা উদ্ভিদকে দেখতে পাই, 18 লক্ষ বছর আগে, প্লেস্টোসিনের প্রারম্ভে সেগুলো সম্ভবত এরকমই ছিল। যদিও খুবই গভীর পর্যবেক্ষণে আমরা হয়তো এমন অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ পেয়ে যাব, যাদের আজ আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

প্লেস্টোসিন-এর 20 লক্ষ বছরের মধ্যে, হিমযুগ আর হিমবিরতি ক্রমান্বয়ে একে অপরের পিছু পিছু আসার কারণে ভূ-ভাগের চেয়ে উদ্ভিদ-প্রকৃতিতে অনেক বেশি পরিবর্তন ঘটেছিল। আমরা এটাও দেখেছি যে, হিমযুগে হিমালয়ের বিশালাকার অঞ্চল ছিল বরফে ঢাকা আর সমতলভূমিতে কিংবা ভারতবর্ষের উপদ্বীপে জলবায়ু ভীষণ শুকনো হয়ে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে সবকিছু অবশ্যই আরো বেশি শুকনো হয়ে যাবার কথা। চলমান যে বালিয়াড়ি এখন কেবলমাত্র রাজস্থানের উত্তর-পশ্চিমে এবং তার আশেপাশেই দেখতে পাওয়া যায়, হিমযুগগুলিতে সম্ভবত সেগুলো আরো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; আরাবল্লীর পশ্চিম দিকে চলে এসে জয়পুরের পরে হরিয়ানা পর্যন্ত ছিল তার বিস্তার। ঐ বালিয়াড়িই বর্তমানে ঐসব অঞ্চলে ছোট ছোট ঢিবির চেহারা নিয়েছে। আজকের হলোসিন কালের তুলনায় অন্যান্য হিমবিরতির কালে উদ্ভিদকুল মরুর কবল থেকে এবং সেই সঙ্গে হিমালয়ের বরফ-চাদর থেকেও অনেক বেশি ভূভাগ পুনর্দখল করতে পেরেছিল।

মানুষ বন কাটতে শুরু করার আগে, কিংবা কৃষিকাজের জন্য জমি পরিষ্কার করা, আর বাকি অংশকে গবাদিপশুর চারণভূমি করে তোলারও আগে পৃথিবীতে যেসব গাছগাছড়া ছিল সাধারণভাবে তাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ (Natural Vegetation) বলা হয়। স্থূলভাবে বলতে গেলে, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পৃথিবীপৃষ্ঠে উদ্ভিদের আস্তরণ আজ থেকে 10,000 বছর আগে হলোসিন-এর ঊষাকালে যেমনটি ছিল, তাদের সেই ঘনত্ব

এবং প্রাচুর্য বৃষ্টিপাতের কমবেশির ওপর নির্ভর করে এক এক জায়গায় অবশ্যই এক এক রকম হয়েছিল— যেসব অঞ্চলে প্রবল বর্ষণ হয় সেখানে নিশ্চয়ই উদ্ভিদ আস্তরণের প্রাচুর্য আর ঘনত্ব অনেক বেশি ছিল; বাংলা এবং উপকূলবর্তী উড়িষ্যায় অবশ্যই 'আর্দ্র চিরহরিৎ' (wet evergreen) অরণ্য ছিল; আর যেখানে কম বৃষ্টিপাত হয় সেখানে ছিল 'স্যাঁতস্যাঁতে পর্ণমোচী' (moist deciduous), অর্থাৎ যে গাছের পাতাগুলো বছরে একবার সম্পূর্ণ ঝরে যায়, এমন অরণ্য। 'সংরক্ষিত' বনাঞ্চল আর পতিত জমিতে যে উদ্ভিদ আস্তরণ আছে সেগুলো একটু ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই, আদিতে স্বাভাবিক উদ্ভিদ কেমন ছিল সেটা ঠিক করা যাবে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। অবশ্য, বেশিরভাগক্ষেত্রেই এগুলো 'জৈবিক অবনয়নের' (biotic degradation) অর্থাৎ মানবের হাতে স্বাভাবিক উদ্ভিদের বদল ঘটা (গাছ কেটে ফেলে, বনজঙ্গল জ্বালিয়ে দিয়ে) কিংবা গবাদি পশুচারণ (ঘাসপাতা সাফ করে) —এসবের ফসল। অন্যভাবে বললে, স্বাভাবিক উদ্ভিদের মানচিত্রে উত্তর ভারতের অধিকাংশ এবং পশ্চিম বিহার জুড়ে বিস্তৃত 'গ্রীষ্মমণ্ডলের শুকনো পর্ণমোচী অরণ্য' নামে পরিচিত অরণ্যভূমির একটা বিশাল অংশকে আজকের মানচিত্রে যেভাবে উত্তর, পূর্ব আর দক্ষিণ অভিমুখী 'স্যাঁতস্যাতে পর্ণমোচী অরণ্য' হিসেবে দেখি, অতীতে হয়তো এদের এইভাবে পরস্পরের থেকে আলাদা করা সম্ভব ছিল না। আমরা আগেই দেখেছি যেখানেই এরকম স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ আস্তরণ রয়েছে, সেখানেই ভূমির জল-ধারণ-ক্ষমতা অনেক বেশি হতেই হবে; তাই বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বাড়বে সেখানে। এরজন্যেই অরণ্যভূমি আরো স্যাঁতস্যাঁতে আরো ঘন হয়ে যাবে। এমনকি বালুচিস্তানের মতো এলাকা, এখন যেটা পুরোপুরি শুকনো; সেখানেও ছোট ছোট স্রোতধারা কিংবা ঢিবি দিয়ে ঘেরা জলাশয়ের পাশে শুকিয়ে যাওয়া গাছের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলতেই হয় যে, নিশ্চয়ই আগে এখানে অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হতো।

আজকে বামনাকার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গাছপালা নিয়ে "গ্রীষ্মমণ্ডলের কণ্টক অরণ্য" (tropical thorn forest) নামে যেগুলো বেঁচে আছে, কৃষিকাজ এবং পশুচারণ কর্মে স্বাভাবিক উদ্ভিদকুলকে নষ্ট করা কিংবা বদলে দেওয়া শুরু করার আগে, সে অরণ্য অন্ততপক্ষে শুকনো পর্ণমোচী ছিল এমনটা হতেই পারে। সিন্ধু উপত্যকার বেশির ভাগ অংশ আর পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্বদিকে, ঠিক তার পরেই বিস্তৃত শুকনো ভূখণ্ড একসময় অবশ্যই এরকম অরণ্যে ঢাকা ছিল। কেন যে হাতি একদিন সমস্ত সিন্ধু উপত্যকায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতো, এর থেকেই সম্ভবত তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কেবল সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলগুলোতেই নয়, 5000 খ্রী পূর্বাব্দের আগে মেহরগড়ে, কোয়েত্তার দক্ষিণে বোলান গিরিপথের নীচের সমভূমিতেও হাতির মৃত শরীর পাওয়া গেছে।

এইভাবে, হলোসিন-এ যখন এখনকার জলবায়ু ইতিমধ্যেই কায়েম হয়ে গেছে,

তখন সিন্ধু উপত্যকা, থর আর উপদ্বীপের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড বাদ দিলে সে যুগের মানুষ ভারতবর্ষে বেশ ঘন অরণ্য দেখতে পেয়েছিল। আর বাদ বাকী অংশেও সম্ভবত অনুর্বরতা বেশ লক্ষ্যণীয় মাত্রায় কম ছিল।

বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক যুগে, ভারতবর্ষ যে সব প্রাণীদের আবাসস্থল ছিল তাদের সম্পর্কে জীবাশ্ম আমাদের অনেক কথা বলেছে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মতো ভারতবর্ষেও ডাইনোসরাসের বাস ছিল, ছিল দৈত্যাকার সরীসৃপ, এদের মধ্যে কয়েকটা তো সমগ্র জীবের ইতিহাসে স্থলভাগের সবচেয়ে বড়ো জন্তু ঃ 2480 লক্ষ বছর আগে ট্রায়ামিক (Triamic) কালের প্রারম্ভে এল ডাইনোসরাস, আর 650 লক্ষ বছর আগে ক্রেটাসিয়াস-এর শেষে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বিশেষত ভারতবর্ষের গণ্ডোয়ানা শিলায় ডাইনোসরাসের জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া গেছে। ডাইনোসরাসরা কেন যে এরকম সম্পূর্ণভাবে গোটা পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেটা একটা রহস্যই রয়ে গেছে। কতরকম তত্ত্ব এ নিয়ে তৈরি হল, এদের মৃত্যু নিয়ে। এর মধ্যে গ্রহাণুপুঞ্জ পৃথিবীকে ধাক্কা মেরেছে এমন তত্ত্বও আছে। এমনকি তাদের অদৃশ্য হবার আগেই, 2130 লক্ষ বছর আগেকার সময়ের সূচনাপর্বে জুরাসিক যুগে আবির্ভূত হয়েছিল পাখি আর স্তন্যপায়ীর আদিমতম প্রজাতি। কিন্তু স্তন্যপায়ীরা যদিও শেষ পর্যন্ত মাংসাশী ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব পশুর জন্ম দিয়েছিলো, তবু ডাইনোসরাসের এই ধ্বংসে তাদের প্রায় কোনো ভূমিকাই ছিল না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্তন্যপায়ীর প্রজাতি কয়েকগুণ হয়ে গেল। ভারতবর্ষেও এটা দেখতে পাওয়া যায় যে, টার্সিয়ারি কালের শেষ পর্বে আর প্লেস্টোসিন-এ খুব বেশি হলেও হাতির সতেরোটি প্রজাতি ছিল। সবই এখন শেষ; ভারতীয় হাতির একটা মাত্র প্রজাতিই এখন বেঁচে আছে ভারতবর্ষে আর একটা প্রজাতি পৃথিবীতে 'আফ্রিকান হাতি' নামে এখনো বিখ্যাত। জলহস্তী এখন কেবল আফ্রিকাতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্লেস্টোসিন সময়ে গাঙ্গেয় অববাহিকা আর নর্মদা উপত্যকা দু'জায়গাতেই তারা বাস করত। বুনো ঘোড়ার এমন কয়েকটি প্রজাতিও তখন ছিল, যারা এখন একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 8000 বছর কিংবা ঐরকম কিছু সময় আগে আজকের দিনের সবচেয়ে বিশালাকার পাখি অষ্ট্রিচও পাওয়া যেতো ভারতবর্ষে।

প্রধানত জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্যই বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে থাকতে পারে ঃ প্লেস্টোসিন-এ বরফ-চাদরের এগিয়ে আসা আর পিছিয়ে যাওয়া অনেক প্রাণী প্রজাতির পক্ষে নিশ্চয়ই অত্যন্ত মারাত্মক হয়েছিল। বিপুল মাত্রায় আগ্নেয় আর ভূ-গাঠনিক সক্রিয়তার ফলেও সেই প্রাচীনতর ভূতাত্ত্বিক যুগে প্রাণীজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু শারীরিকভাবে আজকের আধুনিক মানুষের আবির্ভাবের পর, বিশেষত নব্যপ্রস্তর (Neolithic) যুগ-বিপ্লবের (তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) সময় থেকে মানুষ যে সমস্ত প্রাণীদের বশ মানিয়ে গৃহপালিত করেছিল তারা আর সে নিজেও এই অসংখ্য প্রজাতির

অবলুপ্তির জন্য প্রধানত দায়ী। কৃষি আর চারণভূমির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বন্য প্রাণীদের স্বাভাবিক বাসস্থান সঙ্কুচিত হল কিংবা ধ্বংস হয়ে গেল। একসময় ভারতবর্ষে অরণ্যানির একছত্র সম্রাট ছিল সিংহ; আর আজ সৌরাষ্ট্রের গির সংরক্ষিত অরণ্যে গুটিকতক হাতে গোনা সংখ্যায় ভারতবর্ষে তার অস্তিত্ব কোনোমতে টিকে আছে। শিকারী লেপার্ড বা চিতাকে বনের মধ্যে আর খুঁজে পাওয়া যায় না; খাঁচায় পুরে (বন্দীদশায় এর প্রজনন হয় না) আর নির্বিচারে শিকার করে তার এই বন্য মর্যাদা শেষ করে দেওয়া হয়েছে। 866 জন মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী যে বাঘ, 1903 সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী সেও যখন সংখ্যায় ইতিমধ্যেই এতো দ্রুত কমতে শুরু করেছে, তখন এই প্রজাতির অস্তিত্বও আজ স্পষ্টতই বিপন্ন। গোটা ভারতবর্ষজোড়া বাসভূমি থেকে উৎখাত হয়ে গণ্ডার এখন বেঁচে আছে কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতে। হাতির এলাকাও একইরকমভাবে সঙ্কুচিত হয়ে অরণ্যের কয়েকটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আটকা পড়েছে।

মানুষ যা করেছে তা হল গৃহপালিত পশু, যেমন— গরু বাছুর, ছাগল, ভেড়া, শূকর, ঘোড়া, মুরগীর খামার, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদির শ্রীবৃদ্ধি করা; তবে প্রাণীজ উৎপন্নের জন্য কিংবা তাদের পোষার জন্য আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে তাদের অস্তিত্ব আর সংখ্যা যতটুকু সংগতিপূর্ণ ততটুকুই। প্রাণী সাম্রাজ্যের ওপর মানবজাতি অবশ্যই বেশ ভয়-ভক্তি করার মতো একটা নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে, প্রকৃতির এমন তীব্র মর্যাদাহানি (উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের প্রশ্নেই) যে সম্ভাব্য বিপদ ডেকে আনছে, সে কথা মানুষ নিজেই আজ অনেক অনেক বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছে। কেমন করে প্রকৃতির এখনো পড়ে থাকা অবশিষ্ট সংরক্ষণ করা যায় সে ভাবনাই এখন আমাদের উদ্যোগের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠা উচিত।

টীকা 1.1

ভূতাত্ত্বিক যুগসমূহ ঃ

ভূতত্ত্ব এমন এক বিজ্ঞান যেটা পৃথিবীর ভৌত গড়ন, বিশেষত ভূত্বকের বিষয় অধ্যয়ন করে। কেমন করে পলি আর নদীবাহিত পাথরের টুকরো জমা হয়ে তৈরি হলো পাললিক সমভূমি কিংবা কিছু কিছু শিলায় ভিন্ন ভিন্ন গড়নের স্তরবিন্যাস রইল কেমন করে, এই সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণেই এর প্রথম পাঠ শুরু হয়েছিল। আলবেরুনী তাঁর ভারতবর্ষ সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থে (1035 খ্রী.) এরকম সব পর্যবেক্ষণ থেকেই উপসংহার টেনেছিলেন যে, "এককালে ভারতবর্ষ ছিল একটি সমুদ্র, নদীর বয়ে আনা পলি দিয়ে নানান পরিমাণে যেটি ভরাট হয়ে গেছে।" বর্তমানের আরো যে একটি উপলব্ধি ভূতত্ত্বের পক্ষে এখনো অনেক বেশি কঠিন সেটি হল, ভূত্বকের অভ্যন্তরে উৎপন্ন প্রবল তাপ আর চাপের পরিণতিতে শিলাগুলি গঠিত হয়েছে আর এইভাবে বিভিন্ন শিলা অবশ্যই বিভিন্ন সময়ে আকার পেয়েছে।

এই বিভিন্ন শিলাস্তরের গঠন সম্পর্কে একটি আপেক্ষিক পর্যায়ক্রম গুছিয়ে নেবার যে প্রচেষ্টা তার ভিত্তি রচিত হয় দুটি অনুমানে ঃ

১) সাধারণভাবে, নীচের তলার একটি শিলাস্তর বা শিলাত্বক (stratus) উপরেরটির চেয়ে আগেই ছিল (বর্তমানে আমরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছি)।

২) যে সমস্ত শিলায় একই ধরনের জীবন-চিহ্ন অর্থাৎ জীবাশ্ম রয়েছে, তাদের মোটামুটি সমসাময়িক বলা যায় আর সেই মতো আরো উন্নততর জীবনচিহ্ন সমৃদ্ধ জীবাশ্ম রয়েছে যেখানে, সে সব শিলা সম্ভবত পরবর্তী সময়কালের।

শিলাত্বক যখন একেবারে অনুভূমিকভাবে বিস্তৃত, তাতে যখন খুব বেশি ভাঁজ পড়েনি, ভারতবর্ষের উপদ্বীপ অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশে যেমনটা দেখা যায়, সেক্ষেত্রে উপরের নিয়মদুটোর প্রথমটা প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু এই পর্যায়ক্রম কেবল একটা বিশেষ এলাকা বা অঞ্চলের ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে। আরো অন্য সব জায়গার যে কোন শিলাত্বকের পর্যায়ক্রমের সঙ্গে একে সম্পর্কিত করা যাবে না। তার ওপর, শিলাত্বকে যেখানে অনেক ভাঁজ পড়েছে, হিমবাহ বা নদীর চাঞ্চল্যে যেখানে নুড়ি-পাথর কেবলি স্থান বদল করেছে, পরবর্তী স্তর যেখানে এইভাবে তার আগের স্তরের নীচে চলে যেতে পারে, সেখানে এইভাবে পর্যায়ক্রমটি খুঁজে বার করাই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

এই সব সমস্যার সমাধান করতে আমাদের সাহায্য করে জীবাশ্ম। ট্রিলোবাইট (Trilobite) বা লুপ্ত সামুদ্রিক অ্যানথ্রোপোড (Anthropods)-এর জীবাশ্মের যে চিহ্ন রয়েছে পাকিস্তানের লবণাক্ত অঞ্চলের শিলাভূমিতে, তার সঙ্গে ইওরোপে প্রাচীনতম ক্যামব্রিয়ান 5700 লক্ষ থেকে 5050 লক্ষ বছর আগে) কালের শিলায় পাওয়া প্রাণ-কণার জীবাশ্মের খুব মিল আছে। দেখা যাচ্ছে যে, জীবাশ্ম সমৃদ্ধ লবণাক্ত অঞ্চলের এই শিলাত্বক (stratums) আসলে ক্যামব্রিয়ান সময়েরই হবে। কাজেই যেখানে ভূ-গাঠনিক চাঞ্চল্য কিংবা নুড়ি পাথরের অবিরাম স্থানবদলে শিলাত্বকের পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত জটিলতা, সেখানেও শিলাত্বকে মুদ্রিত জীবাশ্মচিহ্নে আমরা তার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করতে পারি।

ভূতাত্ত্বিক যুগের এই যে প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগ, যেখানে বলি কালপর্ব (Epoch) কিংবা অনুক্রম (series), প্রথমটিতে অনেক দীর্ঘকাল আর দ্বিতীয়ে দীর্ঘকালের পদ্ধতি বোঝানো হয়, শেষের এই পদ্ধতি আবার একসময় কোন বিশেষ 'যুগ' (Eras) বোঝায়। ইওরোপের জন্যে এই সবকিছুই পর্যায়ক্রমে সাজানোর কাজটা প্রথমে শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষে, শিলা এবং অন্যান্য ভূ-ত্বক নিজ নিজ গঠন পদ্ধতির ভিত্তিতে চিহ্নিত হতে শুরু করে, নামগুলোও সেরকম দেওয়া হয় 'ধারওয়ার', 'কুডাপ্পা', 'বিন্ধ্যায়ন'। তারপর এদের অনুক্রমে পর পর সাজানো হয়। এইসব গঠন পদ্ধতি যে কল্প বা যুগসময়ের সঙ্গে যুক্ত বেশ সৌখিন নামও দেওয়া হলো তাদের যেমন, বৈদিক (সবচেয়ে প্রাচীন,

আন্তর্জাতিক নামাঙ্কনে আর্কিয়ান-এর সঙ্গে যার এতো মিল), 'পুরাণ', 'দ্রাবিড়িয়', 'আর্য', এই পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসের একেবারে শেষ ধাপে প্লেস্টোসিন কালের আরম্ভ। কিন্তু সমস্ত ভূতাত্ত্বিক গঠনগুলোকে একটামাত্র আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগে যুক্ত করার সুবিধে এতো বেশি যে মূল ইওরোপিয় পরিকল্পনাটি অবিরত বদল করা হয়। ক্রমাগত উন্নতি ঘটিয়ে আজ সেটি ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর সর্বত্র গৃহীত হয়েছে।

সারনি 1.1 ভূতাত্ত্বিক যুগ

কল্প (Eon)	যুগ (Era)	কাল/পদ্ধতি (কালপর্ব/অনুক্রম) (Period/system) (Epoch/series)	সময়ারম্ভ (লক্ষ বছর আগে)	জীবজগৎ
আর্কিয়ান			40,000	প্রাচীনতম অ্যালগি এবং ব্যাকটেরিয়া
প্রোটেরো-জোয়িক	প্রাক্-ক্যামব্রিয়ান		25,000	স্থান বদলকারী বা ঔপনিবেশিক অ্যালগি; নরম শরীরের অমেরুদণ্ডী
ফ্যানেরো-জোয়িক	প্যালিও-জোয়িক	ক্যামব্রিয়ান	5,700	মাছ
		ওরডোভিসিয়ান	5,050	প্রবাল
		সিলুরিয়ান	4,380	স্থলজ উদ্ভিদ এবং কীট
		ডেভোনিয়ান	4,080	ফার্ণ, মস; উভচর
		কার্বনিফেরাস		
		নিম্ন	3,600	ডানাওলা কীট
		উচ্চ	3,200	সরীসৃপ
		পার্মিয়ান	2,860	—
	মেসো-জোয়িক	ট্রিয়াসিক	2,480	ডাইনোসরাস
		জুরাসিক	2,130	পাখী, স্তন্যপায়ী
		ক্রেটাসিয়াস		
		নিম্ন	1,440	সপুষ্পক উদ্ভিদ, ডাইনোসরাসের অবলুপ্তির শুরু
		উচ্চ	980	ডাইনোসরাসের শেষ সময়
	সেনো-জোয়িক	টার্সিয়ারী		ডাইনোসরাসের অবলুপ্তি
		প্যালিওসিন	650	দীর্ঘকায় স্তন্যপায়ী

কল্প (Eon)	যুগ (Era)	কাল/পদ্ধতি (কালপর্ব/অনুক্রম) (Period/system) (Epoch/series)	সময়ারম্ভ (লক্ষ বছর আগে)	জীবজগৎ
		ইয়োসিন	550	ঘাস
		ওলিগোসিন	380	
		মিয়োসিন	250	মহাবানর
		প্লিয়োসিন	50	হোমিনিড
		কোয়ার্টারনারী		
		প্লেসটোসিন	18	মানব প্রজাতি গবাদি পশু; হাতি, ঘোড়া
		হলোসিন	.1	—

এই পরিকল্পনায়, (1.1 সারণি দেখতে হবে) যদিও অনেক বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়, তবু শিলায় পাওয়া জীবাশ্মে জৈবরাসায়নিক কিংবা জৈবিক আকারে মুদ্রিত সাক্ষরই প্রধানত এই শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তি। মানব প্রজাতি (homo), ঘোড়া (eques), গবাদি-পশু (bos) আর হাতি (elephants)-র আবির্ভাবে চিহ্নিত করা হয় একেবারে শেষের ঠিক আগের প্লেস্টোসিন কালপর্বটিকে। চুম্বক মেরুর স্থান-বদলের প্রগাঢ় পর্যবেক্ষণে এই ধারণাটি প্রস্তাবিত হয় যে, 19 লক্ষ অথবা 18 লক্ষ বছর আগে (কথিত ওলডুভাই ঘটনাবলী) চুম্বক-মেরুত্বের স্বাভাবিক আচরণে বদল হয়েছিল। অবশ্য এখনকার প্রাণী-প্রজাতি যেভাবে উদ্ভূত হয়েছে তার ওপর এই পরিবর্তনের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই, তবে ঐ সময়ক্ষণটিকে প্লেস্টোসিনের আরম্ভ-চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়।

প্রায়িকতার একটা যুক্তিসংগত মাত্রাকে মেনে নিয়ে, ভৌত বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে একেবারে চরম অর্থে ভূতাত্ত্বিক বদলগুলো দিনক্ষণে বেঁধে ফেলা সম্ভব হয়েছে। 'পটাশিয়াম-আর্গন (K-Ar)' পদ্ধতিতে 10,00,000 লক্ষ থেকে 50,000 লক্ষ বছর আগেকার শিলাগুলোর দিনাঙ্কনে একটা প্রবল বাধার পাহাড় টপকানো গেছে। প্রত্ন-চুম্বকত্ব (Paleo-magnetism)-এর পরীক্ষা নিরীক্ষায় চৌম্বকদশা নির্ণয়ের মাধ্যমে একটি শিলার বয়স খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে (দুটি পদ্ধতির জন্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 2.1 টীকা দেখতে হবে)। এরই ফলে 1.1 নং সারণিতে যে ভূ-তাত্ত্বিক সময়কাল দেখানো হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির পাশে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ রয়েছে এবং একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত সেগুলি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য।

তবুও আরো অনেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হতে বাকি। হিমায়ন-দশা সংখ্যায় এতো বেশি আর এতো বিচিত্র তাদের তীব্রতা যে, চারটে কি পাঁচটা প্রধান হিমায়ন দশা বা

হিমযুগ আর তাদের অন্তর অর্থাৎ তাদের মাঝখানের হিমবিরতি দশার ভিত্তিতে প্লেস্টোসিন-এর মান্য বিভাজন পদ্ধতি এখন পরিত্যক্ত। এদের জন্মরহস্যের কারণগুলোও এখন বিতর্কের বিষয়। পৃথিবীর কক্ষপথের বৃত্তীয় আবর্তনশীলতায় সামান্য একটু পরিবর্তন আর তার অক্ষদণ্ডের সামনে-এগিয়ে-আসার কারণে পৃথিবীতে সৌরশক্তি গ্রহণের যে বিচিত্রতা সেটিই হিমায়নকে ডেকে এনেছিলো, অনেককাল আগের এই প্রস্তাবনা এখন ফিরেফিরে উঁকি ঝুঁকি মারছে। অবশ্য অন্যান্য কারণগুলো, যেমন সামুদ্রিক স্রোতের ওপর মহাদেশীয় সঞ্চরণের প্রভাব, এগুলোর ওপরও এখন জোর দেওয়া হচ্ছে।

1.2 ব্যবহৃত পুস্তক সমূহের টীকা ঃ

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া-র 1907 সালে প্রকাশিত নতুন সংকলন-এর প্রথম খণ্ডের অধ্যায়গুলিতে ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো এই সময়ের স্বীকৃত বিশেষজ্ঞদের রচনা। ঐ একই প্রসঙ্গে সম্মানীয় বিশেষজ্ঞদের রচনায় সমৃদ্ধ দি গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন, প্রথম খণ্ড, 'দেশ ও দেশের মানুষ' (কান্ট্রি এণ্ড পিপ্‌ল) 1965 সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। দুটি প্রকাশনাই হয়তো এখনকার পক্ষে একটু পুরোনো, তবু অনেক মূল তথ্য এখনো পাওয়া যায় এখান থেকে।

এস. এম. মাথুর, ফিজিক্যাল জিওলজি অফ ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, 1986 (1991 সালে পুনর্মুদ্রিত)— গ্রন্থে ভূতত্ত্বের সমস্ত তথ্য বর্তমানের নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন। 1.2 নং টীকায় ব্যবহৃত আলবেরুনীর উদ্ধৃতি এডওয়ার্ড সি. সচু-র, আলবেরুনিস্ ইন্ডিয়া, লন্ডন, প্রথম খণ্ড, 1910, 198 পাতা থেকে নেওয়া।

ভূগোলের সমস্ত বিষয়ের জন্য, ধ্রুপদী কাজটি এখনো পর্যন্ত করেছেন ও. এইচ. কে স্পেট আর এ. টি. এ. লার্নমাউথ তাঁর 'ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান' এ জেনারাল এন্ড রিজিওনাল জিওগ্রাফি, মেথুয়েন, লন্ডন, 1967 বইটিতে। এরমধ্যে শুধু যে প্রাক-1947 সীমানাঘেরা (বাংলাদেশ তখন পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়নি) ভারতবর্ষকে ধরা হয়েছে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীলঙ্কার ওপর বি. এইচ ফার্মারের একটা লেখা, আর নেপাল এবং ভুটানের একটা সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণও রয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আর রাজনৈতিক সীমানার জন্যে জন বার্থালোমিউ এন্ড সন্‌স-এর ওয়াল্ড ট্রাভেল সিরিজ, -এ মুদ্রিত, 1 4 মিলিয়ন স্কেলে আঁকা, বার্থালোমিউ-এর ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্র আর বেশ সুবিধাজনক দামে অক্সফোর্ড স্কুল অ্যাটলাস অফ ইন্ডিয়া-তে ওরই পুনর্মুদ্রিত অংশবিশেষ অসাধারণ কাজের। গোটা ভারতবর্ষকে 4 ডিগ্রী অক্ষাংশ আর 8 ডিগ্রী দ্রাঘিমার টুকরোয় ভাগ করে সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার 1 1 মিলিয়ন স্কেলে তৈরি ভারতবর্ষের মানচিত্রটি আরো

বিশদ বিবরণে আগ্রহীদের কাজে লাগবে বইটির দামও তুলনামূলকভাবে কম। এ. পি. চ্যাটার্জির উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ন্যাশনাল অ্যাটলাস অফ ইন্ডিয়া যে সরকারি নিয়মকানুনের বেড়াজালে পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হতে পারল না, তা দুর্ভাগ্যজনক আর এর আলাদা আলাদা মানচিত্রগুলোও এখন সহজে পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিক ভূগোলে আগ্রহী মানুষজন জোসেফ ই. স্কোয়ার্জবার্গ (Schwartzberg) -এর সম্পাদিত এ হিস্টোরিক্যাল অ্যাটলাস অফ সাউথ এশিয়া, শিকাগো এন্ড লন্ডন, 1978-এ সঙ্কলিত বইটিতে সবচেয়ে বিশদভাবে ঐতিহাসিক মানচিত্র পাবেন। রাজনৈতিক আর সাম্রাজ্যের ইতিহাসের জন্যে এটা খুব ভালো; তবে অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক মানচিত্রের ক্ষেত্রে তেমন সফল নয়।

দি টাইমস অ্যাটলাস অফ দি ওয়ার্ল্ড কমপ্রিহেনশিভ এডিশান, 1997, 12 নং পৃষ্ঠার তালিকা থেকে ভূতাত্ত্বিক যুগবিষয়ক আমাদের 1.1 নং সারণি আঁকা হয়েছে; আর ভূতাত্ত্বিক সময় বিষয়ক তালিকাটি মেরিয়ান-ওয়েস্টার কলেজিয়েট ডিকশনারি, দশম সংস্করণ, 1996, 487 নং পৃষ্ঠা থেকে; দুটি বই-এর প্রকাশকেরই আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ পাওনা।

1.1 নং মানচিত্রটি অংশত ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, 198 খণ্ড, নম্বর 2, আগস্ট, 2000, 50 নং পাতা থেকে আঁকা; আর 1.2 নং মানচিত্রটি, একইরকমভাবে টাইমস অ্যাটলাস অফ দি ওয়ার্ল্ড, 13 নং পাতার মানচিত্র থেকে নেওয়া। স্কোয়ার্জবার্গের আই বি-1 প্লেটটির ভিত্তিতে তৈরি আমাদের 1.3 নং মানচিত্রটি। গিলবার্ট টি ওয়াকার-এর, মান্থলি এন্ড অ্যানুয়াল নর্মালস্ অফ রেনফল এন্ড রেনিডেস্ ফ্রম রেকর্ডস আপ টু 1920, কলকাতা, 1924 থেকে 1.4 নং মানচিত্রটি ফয়েজ হাবিব বিশেষভাবে সংকলিত করেছেন। বৃষ্টিপাতের রিপোর্ট-দেওয়া কেন্দ্রগুলোর সংখ্যা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি এবং বর্মা (মায়ানমার)-ও সেই এলাকার মধ্যে রয়েছে। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, আফগানিস্তান আর ইরানের পূর্ব সীমান্তের জন্য অন্যান্য জায়গা থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

2

আমাদের আদি পূর্ব পুরুষেরা

2.1 মানব প্রজাতির বিবর্তন

আদিম কোনো এক মানবযুগল— আদম আর ইভ, তাদের থেকে কিংবা এইরকম অন্য কোনো উপায়ে একমুহূর্তে হঠাৎ সৃষ্ট হলো মানবপ্রজাতি— সৃষ্টিরহস্যের মীমাংসায় প্রচলিত বিশ্বাসে এমনি ইঙ্গিত মেলে। 1859 সালে 'অরিজিন অফ স্পেসিস' (প্রজাতির উদ্ভব) বইটিতে চার্লস ডারউইন যখন তাঁর বিবর্তনের তত্ত্ব প্রকাশিত করলেন, তখন টলে গেল এই বিশ্বাস। চার বছর পরে টমাস হাক্সলি ঘোষণা করলেন যে, এই একই নীতিতে, বিবর্তনের দীর্ঘ এক প্রক্রিয়ার ফলেই মানবপ্রজাতি আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। শুরু হলো সন্ধান— 'হারানো যোগসূত্র' অর্থাৎ যে মধ্যবর্তী প্রজাতিগুলির মধ্যে দিয়ে সেই অনেকটা বানরের মতো এক পশু থেকে আজকের এই শারীরিক গঠনের আধুনিক মানুষের (হোমো স্যাপিয়েনস) উদ্ভব হলো তার সন্ধান। প্রাচীনকালের জৈব বস্তুর মূল আকার বা গঠন এখনো যেসব শিলায় সংরক্ষিত, তাদের অস্তিত্বের চিহ্নগুলি পড়ে আছে যেখানে, যাকে বলি জীবাশ্ম, তাদের কাছেই পাওয়া গেল এই সাক্ষ্য। অনেক অনেক যুগ আগের অতীত নিয়ে আজ যখন আমরা নাড়াচাড়া করছি, তখন তো সেই জৈব বস্তুর কোনো কিছুই এখনো টিকে থাকবে এমন আশা করা যায় না।

প্রায় একশ' বছর আগে, এই ভারতবর্ষের শিবালিক পাহাড়ে আবিষ্কৃত হল জীবাশ্ম হয়ে-যাওয়া মহা-বানর— নাম যার রামাপিথেকাস (Ramapithecus), প্রাচীনতর মিয়োসিন পলিতে (250 লক্ষ থেকে 160 লক্ষ বছর আগে) পাওয়া গেল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক ভুল হয়ে গেল। মানব জাতির বিবর্তনে এটিই মধ্যবর্তী প্রজাতির প্রতিনিধি এমন বিশ্বাস তৈরি হল। কিন্তু এখন জানা গেছে যে, সম্ভবত রামাপিথেকাস হলো সিনাপিথেকাস (Sinapithecus)-এর নারী-বৈচিত্র্য, দুটিরই কঙ্কাল-জীবাশ্ম পাওয়া গেছে পাকিস্তানে, সেই সঙ্গে অন্যান্য দেশগুলোতে, ওরাংওটাং-এর আত্মীয় এই প্রজাতি ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুর দেখা যেত। অর্থাৎ মানববিবর্তনের প্রধান ধারা থেকে সরে-যাওয়া ধারাগুলোয় আর একটি অন্তর্ভুক্ত হল। তাই, আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এদের ধরা যাবে না। আফ্রিকার ভেতরেই প্রথমে আমাদের পূর্ব উত্তরাধিকারের শাখাপথটি উদ্ভূত হয়েছিল। আমাদের শাখা থেকে অন্য উপশাখায় সরে-যাওয়া আরেকটি প্রজাতি থেকে আফ্রিকার দুটি বিশাল বনমানুষ শিম্পাঞ্জী আর গরিলার উদ্ভব। কেনিয়ায় পাওয়া কেনিয়াপিথেকাস (Kenyapithecus, 140 লক্ষ বছর আগের) এই প্রধান প্রাক-মানবিক ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে করা হয়। অবশ্য মানব-প্রজাতির মতো এরা দ্বিপদী নয় (অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে এরা সোজা হয়ে দুপায়ে হাঁটতে পারে না)।

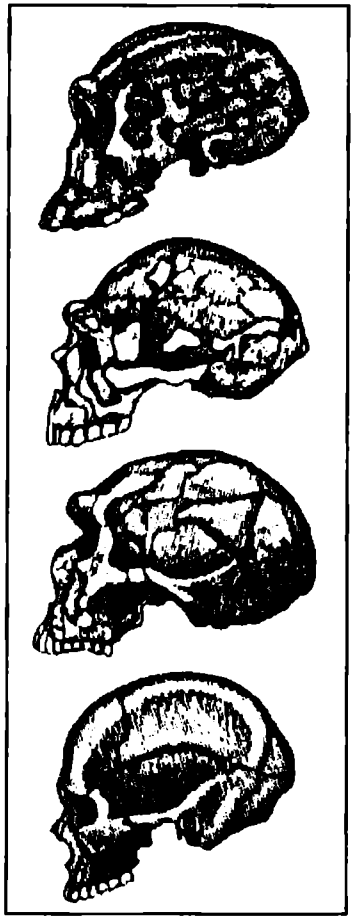

চিত্র 2.1 মানব প্রজাতির বিবর্তন
পুনর্নির্মিত জীবাশ্ম-করোটি
(ওপর থেকে নীচে)
2.1ক হোমো হাবিলিস;
2.1খ হোমো ইরেকটাস;
2.1গ হোমো স্যাপিয়েন্স
নিয়ানডার্থালেনসিস;
2.1ঘ হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স
(আমাদের প্রজাতি)
সমস্ত করোটিগুলি মোটামুটি একই স্কেলে
আছে (ইয়ান টাট্যারসাল অনুসরণে)

পূর্ব আফ্রিকায় আর একটি প্রামাণ্য আবিষ্কারে পাওয়া গেলো প্রজাতির আরেকটি গোষ্ঠী, নাম তার অস্ট্রালোপিথেসিন (Australopithecine), 38 লক্ষ বছর আগের কিংবা ওরই সমসাময়িক যুগের পুরোনো এরা। দ্বিপদী হওয়ায় এরা সত্যিই মনুষ্য প্রজাতিভুক্ত। 32 লক্ষ বছর আগেকার এক নারীর কঙ্কাল-জীবাশ্ম পাওয়া গেল ইথিওপিয়ায়, আবিষ্কারকেরা তার নাম দিলেন 'লুসি'। ছোটখাটো কাঠামোর শরীর, খুলির (মগজের খোপ) ক্ষমতা অর্থাৎ আয়তন মাত্র 400 ঘন সেন্টিমিটার (যেখানে আধুনিক মানুষের খুলির মাপ 1250 থেকে 1450 ঘন সেমি.) এবং যে প্রজাতির অন্তর্গত এই নারী তার নাম অস্ট্রালোপিথেকাস অ্যাফারেন্সিস (Australopithecus afarensis)। সমগ্র পূর্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় একইরকম আরো একটি প্রজাতি ছিল, তবে তারা একটু 'বলবান' ধরনের (অর্থাৎ আরো ভারি আর মোটা হাড়ের)। বরং দক্ষিণ আফ্রিকাতে অন্তত 23 লক্ষ বছর আগে অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস (Australopithecus africanus) নামে একটু ছিপছিপে (অর্থাৎ পাতলা হাড়ের) একটি প্রজাতি বিকশিত হয়েছিল যাদের খুলির ধারণ-ক্ষমতা সামান্য বেশি (500 ঘন সেমি.)। সম্ভবত তারা গাছের ডাল দিয়ে ধাক্কা মারতে কিংবা আঁচড় কাটতে পারত, পাথরও ছুঁড়তো, কিন্তু তাদের জিনিসপত্রের মধ্যে যত্ন করে তৈরি করা কোনো কাজের জিনিস ছিল না।

যেসব প্রজাতি 'ছিপছিপে' ছিল তাদের পেশিশক্তি একটু কম ছিল বটে, কিন্তু অন্যদিকে তারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ

করে হাত আর আঙুল অনেক নিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারত। কাজেই এই অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস নামের প্রজাতিটি শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে আমরা যাকে প্রথম সত্যিকারের মানব প্রজাতি হোমো হাবিলিস বলে থাকি তার খুবই কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল (চিত্র নং 2.1 ক)। 26 লক্ষ বছর থেকে 17 লক্ষ বছর আগে, পূর্ব আফ্রিকা আর দক্ষিণ আফ্রিকা উভয় অঞ্চলেই, যে হোমো হাবিলিস দেখতে পাওয়া যেত তাদের খুলি-ধারণ-ক্ষমতা 700 ঘন সেমি. হওয়ায় আগের সমস্ত মানব প্রজাতির

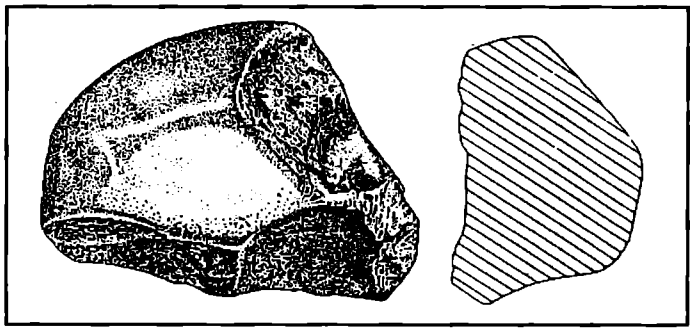

চিত্র 2.2 'ওলডোয়ান' পাথরের হাতিয়ার (ক্র.) 20 লক্ষ বছর আগেকার, সোয়ান অববাহিকা, রিয়াত (পাকিস্তান আর্কিওলজি থেকে, নং 24)

তুলনায় তারা অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিল এমন অনুমান করাই যায়। একটা পাথর দিয়ে অন্য পাথরে ঘা মেরে তারা পাথরের হাতিয়ার বানাতে পারত আর এইভাবে পাথরের ভেতর-অংশ কাটার জন্যে ধারালো ফলা পেতে ভেঙে ফেলত পাথরের স্তর (2.2 নং ছবি দেখতে হবে)। কেনিয়ার ওলডুভাই (Olduvai) অঞ্চলে এরকম হাতিয়ার প্রথম পাওয়া যায় বলে ওখানকার নামানুসারে এদের বলা হল 'ওলডোয়ান' (Oldowan)। হোমো হাবিলিসের সম্মিলিত জীবনের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তার মস্তিষ্কের ব্রোকা (Broca) অঞ্চলের উন্নতির ফলে, আমরা আজ যাকে 'শব্দ' বলি, সেরকম এক গুচ্ছ আওয়াজ সে ইতিমধ্যেই ব্যবহার করত এমন হওয়া সম্ভব।

আফ্রিকাতে হোমো ইরেকটাস (Homo Erectus) মানবপ্রজাতির মধ্যে হোমো হাবিলিসের হোমো এরগাস্টার (Homo Ergaster) নামের আর একটি সমসাময়িক সঙ্গীও ছিল, কিন্তু তার বয়স ছিল অপেক্ষাকৃত কম (2.1 খ নং চিত্র দেখতে হবে)। এই প্রজাতির শরীর কাঠামোর একটি জীবাশ্ম রয়েছে আফ্রিকাতে যার বয়স 18 লক্ষ থেকে 2 লক্ষ বছর; অবশ্য গোটা প্রজাতিটা 20 লক্ষ বছরের পুরোনো। হোমো হাবিলিসের চেয়ে হোমো ইরেকটাস অনেক বেশি বলবান ছিল, আর খুলি বেশি মোটা হলেও তার ধারণ-ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে 1000 ঘন সেমি. হয়ে গিয়েছিল। এই হলো সেই প্রথম

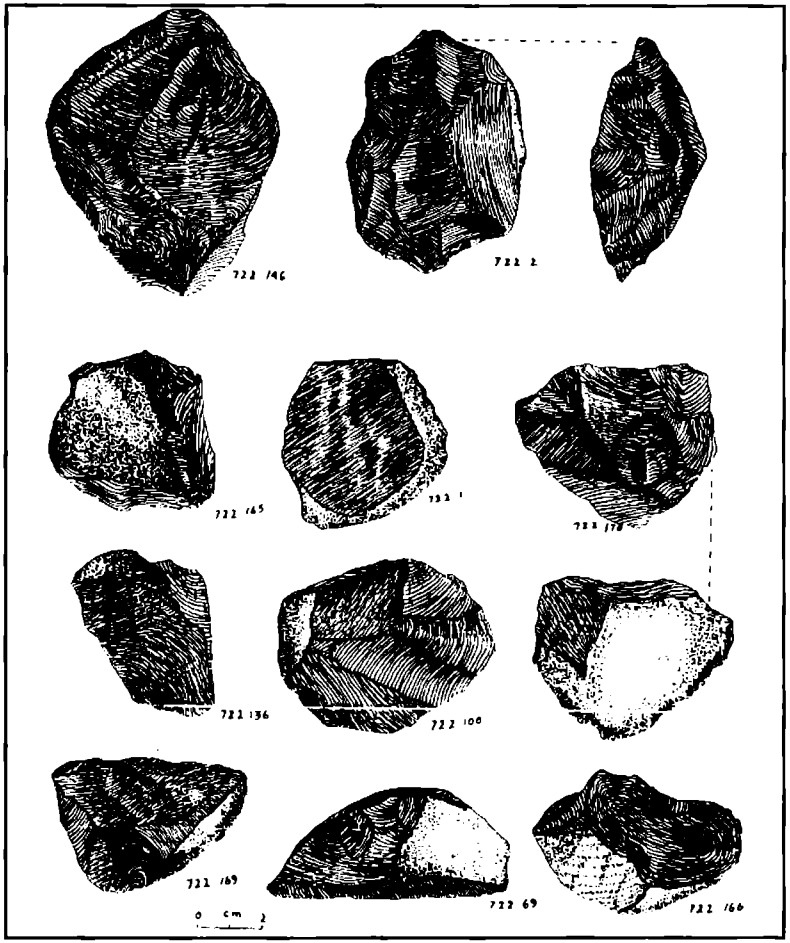

চিত্র 2.3 পাব্বি পাহাড়ের স্তরকাটা পাথরের হাতিয়ার

টীকা নং 722.1 (দ্বিতীয় সারি, ওপর থেকে মাঝখানে) একখণ্ড নুড়ি-পাথর যার থেকে একটা বড়ো পাত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। (সঈদ এম. আসফাখ অনুসরণে)

প্রজাতি যে জানতো কেমন করে আগুন ব্যবহার করতে হয়, কেমন করে বশে আনা যায় তাকে (এর প্রমাণ মিলেছে 14 লক্ষ বছর বা তারও আগে আফ্রিকার কেনিয়াতে, চেসোওয়ানজা থেকে)। হোমো হাবিলিস যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করত প্রথমদিকে হোমো ইরেকটাসও ঐ একই হাতিয়ার কাজে লাগাতো, কিন্তু সেগুলোতে ছিল আরো

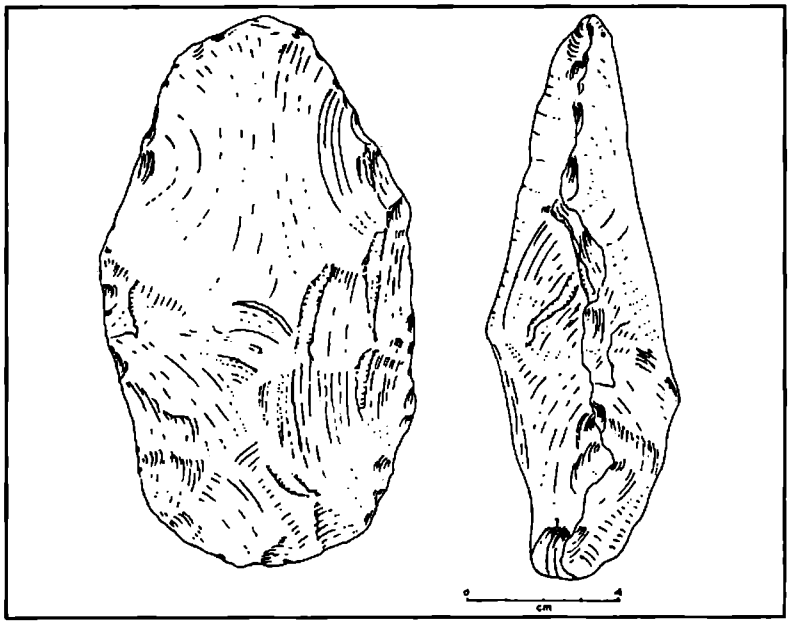

চিত্র 2.4 সোয়ান অববাহিকার হাত-কুঠার (অ্যাকিউলিয়ান)
(এম. সালিম অনুসরণে)

অনেক বেশি দক্ষতার ছাপ। শুধু পাথরের ভেতরের অংশের আকার বদলেই তারা থামল না, এক একটা স্তর কেটে ফেলে তাকে হাতিয়ারের রূপ দিল আর এইভাবেই 'স্তরকাটা নুড়িপাথরের হাতিয়ার' (Flaked pebble tool)-এর শিল্প তৈরি হয়ে গেল (2.3 নং ছবি দেখতে হবে)। শেষে হলো হাত-কুঠার যেখানে পাথরের দুদিকেই ঢাল আর সেটা 'দুমুখওয়ালা' এভাবে পাথরের একটা দিক হলো হয় অমসৃণ নয়তো এমন ধারালো যাতে কোনো কিছু কাটা যায়। এটি সরাসরি হাতে ধরা হতো। এরকম হাত-কুঠার তৈরির করণ-কৌশলকে বলে আকিউলিয়ান (Acheulean) (2.4 নং চিত্র)। এরকম আদ্দিকালের, 14 লক্ষ বছর আগেকার হাত-কুঠার আছে আফ্রিকা মহাদেশে, ইথিওপিয়ার কোনসো-তে। ওলডোয়ান আর আকিউলিয়ান— উভয় করণকৌশলই পুরাতত্ত্বে নিম্নতর (lower) বা একটু পুরোনোকালের (Earlier) প্রাচীন প্রস্তর যুগের (Palaeolithic; Paleo — প্রাচীন lithic — পাথর) অন্তর্গত। ('নিম্নতর' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে আর পুরাতত্ত্বের ভাষায় বলা হয়েছে একটু পুরোনো বা 'প্রাচীনতর', কেননা তলার স্তরটা সবসময়ে ওপরের স্তরের চেয়ে আগেকার। উল্টোদিকে 'উপরের' মানে হলো 'পরের')

2.2 ভারতবর্ষে আদি মানুষ

আফ্রিকার ঘাসজমি আর ঘন অরণ্যে বেড়ে ওঠা হোমো হাবিলিস (অথবা পুরাকালের এক হোমো ইরেকটাস) যে তার পরিবেশের বাধা অতিক্রম করে ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যময় জলবায়ুর এলাকায় সুদূর চীন (লং গুপ্পো যেখানে 18 লক্ষ থেকে 19 লক্ষ বছরের পুরোনো চোয়ালের জীবাশ্ম আর তার সঙ্গে ওলডোয়ান হস্তশিল্প পাওয়া গেছে) থেকে স্পেনে (বারাঙ্কো লিওন-এ, 18 লক্ষ বছর আগের) ছড়িয়ে পড়েছিল, মানব প্রজাতির পক্ষে সে ছিল সাফল্যের এক দিকচিহ্ন। দামিনিসি-তে (জর্জিয়া, ককেশাস) 17 লক্ষ বছর আগের আর মোজোকার্টো-তে (জাভা, ইন্দোনেশিয়া) 18 লক্ষ বছর আগের হোমো-ইরেকটাস বলে সনাক্ত করা সমসাময়িক কালের অনেক প্রজাতির জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। দামিনিসি-তে জীবাশ্মের সঙ্গে ওলডোয়ান হাতিয়ারও ছিল।

এইসব প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র, হোমো হাবিলিস কিংবা প্রথম দিকের হোমো ইরেকটাসও যেগুলি ব্যবহার করত, তাদের চিহ্ন রয়েছে পাকিস্তানের মাটিতেও। পাকিস্তানের (চিত্র 2.2) পাঞ্জাবের পশ্চিমে, পতওয়ার মালভূমির সোয়ান উপত্যকায় অবস্থিত রিয়াত-এ এগুলো পাওয়া গেছে, প্রাচীনত্বের বিচারে 20 লক্ষ বছরেরও বেশি পুরোনো সেগুলো। একইরকমের হস্তশিল্পের নমুনা ছড়িয়ে রয়েছে হিমাচল প্রদেশের শিবালিক পাহাড়ে, সেই পুরোনো কালের ছাপ তাদের শরীরেও (18 লক্ষ বছর কিংবা তারও পুরোনো কালের)।

এমনকি খাঁটি হোমো হাবিলিস যদি আফ্রিকার বাইরে ছড়িয়ে পড়েও থাকে, তবু প্রাচীনা এ পৃথিবীর সর্বত্র যার চিহ্ন প্রভূত মাত্রায় দেখা যায়, সেই হোমো ইরেকটাস সময়ের বিবর্তনে হোমো হাবিলিসকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাচীনতর চিহ্নগুলো ছাড়াও সে ঢুকে পড়েছিল উত্তর চীনের শীতলতর অংশেও (ঝৌকুওদিয়ান, 7 লক্ষ বছর আগে);জাভার ঘন অরণ্যসঙ্কুল দ্বীপেও (ঐ একই সময়ে) তখন সে বসবাস শুরু করেছে। এমনকি তার কাজের হাতিয়ারগুলো যখনো পর্যন্ত প্রধানত অমসৃণ ভাঙাচোরা পাথরের টুকরোর ভেতরের অংশ কিংবা তার খাঁজকাটা স্তর, সে সময়েও তার শক্তপোক্ত বলবান কাঠামো, মুখের কথার ওপর অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ আর দীর্ঘাকায় মগজ তাকে অনেক বেশি সুবিধা দিয়েছিল। আগুনকে সে ব্যবহার করতে পারত নানাভাবে;উষ্ণতা পেতে, বন্যজন্তুকে ভয় দেখাতে কিংবা জঙ্গল পরিষ্কার করতে, তবে খুব সম্ভব তখনো পর্যন্ত মাংস আর হাড় ঝলসে খেতে জানত না।

পাকিস্তানে পাব্বি পাহাড়ে, ঝিলম নদীর তীরে সোয়ান উপত্যকায় পাওয়া প্রধান স্তরকাটা পাথর (Flaked pebble), যাকে কিনা 'টুকরো করার কাটারি' (Chopper Chopping)-ও বলা হতো সেইরকম হাতিয়ারের বয়স 10 লক্ষ বছর কি তারও বেশি (2.3 নং ছবি দেখতে হবে)। হিমাচল প্রদেশের বিপাশা, বনগঙ্গা আর অন্যান্য নদী

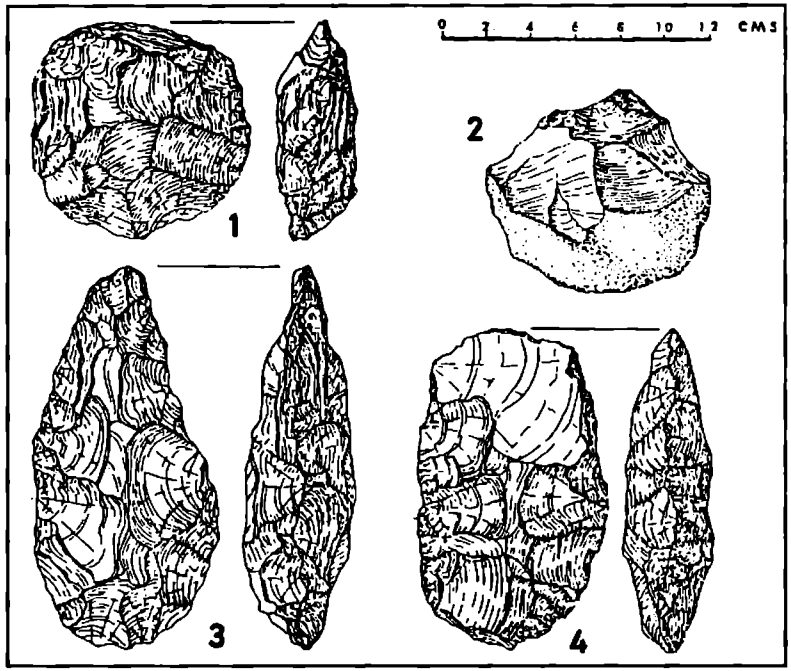

চিত্র 2.5 'মাদ্রাজী শিল্প' হাতিয়ার (1) পাত বিচ্ছিন্ন করার পর; (2) কাটারি; (3) হাতকুঠার; (4) ক্লিভার (হাতুড়ি?); (বি এবং আর অলচিন অনুসরণে)

উপত্যকাতেও একই রকমের হস্তশিল্পের নমুনা পাওয়া গেছে তবে তাদের শরীরে বয়সের স্তরচিহ্ন নেই। এই গোটা এলাকায় ঐ যুগের হোমো ইরেকটাসের কোনো জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু এইরকম যন্ত্রপাতি যে ঐ প্রজাতিরই হাতের কাজ এটা প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিত বলে মনে হয়।

হাত কুঠার বা আকিউলিয়ান শিল্প (আফ্রিকাতে 14 লক্ষ বছরের আগে ইতিমধ্যেই যেটি প্রচলিত) 7 লক্ষ থেকে 5 লক্ষ বছর আগের সময়কালে টুকরো করার কাটারির মতো হাতিয়ারের সঙ্গে একইসাথে সোয়ান উপত্যকায় দেখা গিয়েছিল (2.4 নং ছবি দেখতে হবে)। হাত-কুঠার সমেত ঐ একইরকম সময়কালের ঐ একইরকম সব হাতিয়ার কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এর সমতলে পাওয়া গেছে বলে জানানো হয়েছে। এটা হতে পারে যে, ছুঁড়ে মারতে সুবিধে হয় এমন হাত-কুঠারে সশস্ত্র, আগুনকে নিজের বশে এনে অনেকটা সুরক্ষিত এই হোমো-ইরেকটাস (Scavenger— অন্যের মারা পশুর মাংস যারা খায়) ফলমূল আর বুনো ঘাসের বীজ সংগ্রাহক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছোটো প্রাণী শিকারীও হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষের বাদবাকি অংশে এই হোমো ইরেকটাসের ছড়িয়ে পড়তে একটু সময় লেগেছিল। ভূতাত্ত্বিকরা যাকে মধ্য প্লেস্টোসিন কাল (7 লক্ষ 30 হাজার থেকে এক লক্ষ তিরিশ হাজার বছর আগে) বলেন, সে সময়েই প্রকৃতপক্ষে এই বিস্তার ঘটেছিল। হিমযুগের অত্যন্ত ঠাণ্ডা শুকনো সময়কালে যখন অরণ্য উজাড় হয়েছিল অথবা হিম-অন্তর্বর্তী উষ্ণ স্যাঁতস্যাঁতে দশায় যখন নিবিড় হয়েছিল অরণ্য, তখন এই পরিবেশ তাকে যে কিভাবে বাধা দিয়েছিল নাকি সাহায্য করেছিল, সেকথা এখন বলা সম্ভব নয় (প্লেসটোসিন কালপর্বের এইসব দশার জন্যে 1.2 নং অধ্যায় দেখতে হবে)। কর্ণাটকের হান্সগি উপত্যকা আর চেন্নাই-এর কাছে অবস্থিত আত্তিরামপাক্কাম সমেত দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে 'প্রাচীন আকিউলিয়ান হাতিয়ার' (তথাকথিত 'মাদ্রাজীশিল্প) অর্থাৎ হাত কুঠার ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটেছিল (চিত্র 2.5 দেখতে হবে)। U-Th (ইউরেনিয়াম-থেরিয়াম) পদ্ধতিতে কর্ণাটকের স্থানগুলির বয়স বেরিয়েছে 3 লক্ষ 50

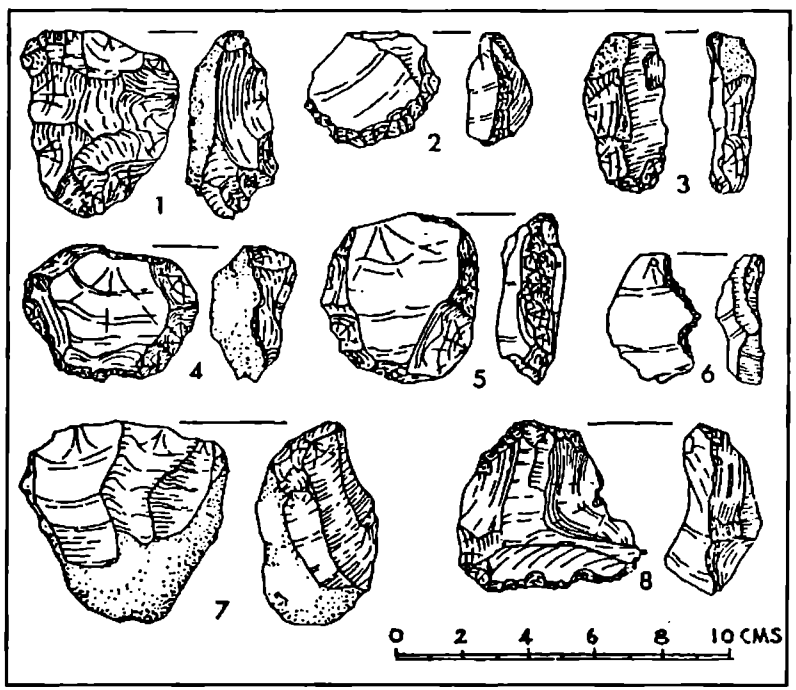

চিত্র 2.6 'নেভাসা' হাতিয়ার। নং 3 একটি পাতযুক্ত ছুরি, মধ্য প্রাচীনপ্রস্তর যুগের চিহ্ন নং 7, যেখানে স্তরকাটা নুড়িপাথরের শিল্পের ধারাবাহিকতা দেখা যাচ্ছে, সেটি লক্ষ্যণীয় (বি. এবং আর. অলচিন অনুসরণে)

হাজার বছর। ঐ একই পদ্ধতিতে রাজস্থানের দিদওয়ানায় পাওয়া নিম্নস্তরের প্রাচীন প্রস্তর যুগের হস্তশিল্পকৃতি 3 লক্ষ 90 হাজার বছরের পুরোনো আর মহারাষ্ট্রের আহম্মদনগর জেলায় নাভাসা সামগ্রী 3 লক্ষ 50 হাজারের পুরোনো বলে দেখা গেছে।

ছড়িয়ে-পড়ার এই প্রক্রিয়া চলার সময়, কালক্রমে আদি হোমো ইরেকটাসের মধ্যে কয়েকটি উপ-প্রজাতিতে বিভক্ত হবার একটা ঝোঁক দেখা গেল। শক্তি তাদের একটু কম হলেও তারা ছিল অনেক বেশি দক্ষ আর সেকারণেই পাথরের ভাঁজ থেকে আরও ছোটো ছোটো হাতিয়ার অর্থাৎ 'পরবর্তী আকিউলিয়ান হাতিয়ার' তারা তৈরি করতে পারত। হাতনোরাতে 'নর্মদা করোটি' আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে নর্মদা উপত্যকায় এইরকম হাতিয়ারের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গেছে। একটি বিকশিত হোমো ইরেকটাস প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এই করোটি অনেক অনেক দূর-অতীতের কথা বলতে পারে; 1,30,000 বছরের চেয়েও অনেক আগের কোনো সময়ের কথা।

হোমো ইরেকটাস যতই বিকশিত হচ্ছিল ততই তার হাতের তৈরি হাতিয়ারগুলো উন্নত হচ্ছিল। তাদের সে নতুন নতুন আকার দিচ্ছিল, নানান অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন যেসব উপাদান পাওয়া যাচ্ছিল সেইমতো তার করণকৌশলকে সে মানানসই করে তুলছিলো। খুবই ধীরে ধীরে চোখে পড়ে এমন সব পরিবর্তন। কয়েক হাজার বছর লেগে যায়। কিন্তু শেষমেশ নানান আঞ্চলিক 'সংস্কৃতি'-র অভিমুখেই এই পরিবর্তন চালিত হয়। পুরাতত্ত্ববিদরা যখন এক বা একাধিক অঞ্চলের একটা বিশেষ স্তরে একইরকম হাতিয়ার, অলংকার আর মানবশ্রমে উৎপন্ন অন্যান্য সামগ্রী, যাদের এককথায় তাঁরা 'হস্তশিল্পকৃতি' বলেন তার সমাবেশ দেখতে পান, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একই ধরনের রীতিনীতি, বিশ্বাস যেমন, মৃতদেহ সৎকারের বিভিন্ন প্রথা, নানান ধর্মীয় সংকেত-চিহ্ন তাঁদের চোখে পড়ে, ঠিক তখনি 'সংস্কৃতি' এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। হোমো ইরেকটাসের কথা ধরলে, তার প্রথা বা বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। কেবলমাত্র তার পাথরের হাতিয়ারের গড়নই তার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির নানান সূত্র আমাদের যোগান দেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেলে পর, আরো ছোটো আরো হালকা হাতিয়ার উৎপাদনের প্রবণতা আসে। আর এমনই এক প্রবণতার স্বাভাবিক পরিণতি পৃথিবীর নানান স্থানে আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন চেহারার স্তরকাটা ছুরির ফলার (flake blade) আবির্ভাব। এই স্তরকাটা ছুরির ফলাকে ভারতবর্ষে মধ্যপ্রস্তর যুগের চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়। 'নেভাসা সংস্কৃতি'-তে (নেভাসা অঞ্চলের নামানুসারে এই নাম এ কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে) এরকম পাথুরে ছুরির ফলার (stone blades) দেখা যায়। এই সংস্কৃতিই মনে হয় পরে দক্ষিণের উপদ্বীপে এবং মধ্যভারতে প্রসারিত হয়েছিল (2.6 নং চিত্র দেখতে হবে)। TL পদ্ধতিতে দিদওয়ানার মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগের বয়স পাওয়া গেল প্রায় 1,50,000 বছর আগেকার অথচ গুজরাটে, U-Th পদ্ধতির সাহায্যে 56,800 বছর আগের কোনো সময় পাওয়া গেল। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ দিকের উষ্ণ এলাকায় এই

যুগের বয়স 2,00,000 থেকে 40,000 বছর আগেকার বলে ধরা হয়েছে। কাজেই এই সংস্কৃতি খুব বেশি না হলেও একশ' হাজার বছর বেঁচেছিল। নিম্নতর প্রাচীন প্রস্তর যুগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতায় এই সংস্কৃতি যুক্ত ছিল। আর কোথাও, অন্য কোনো অঞ্চলে যদিও কঙ্কালের কোনো ভগ্নাবশেষ এখনো পাওয়া যায়নি, তবু এর স্রষ্টারা সম্ভবত ছিল হোমো ইরেকটাসের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী।

সারণি 2.1 পাথুরে যুগ-দশা, হাতিয়ারের গড়ন, প্রজাতি

যুগ	হাতিয়ারের ধরন	প্রথম ব্যবহারকারী হিসেবে চিহ্নিত প্রজাতি
নিম্নতর প্রাচীন প্রস্তর	ওলডোয়ান	হোমো হাবিলিস
নিম্নতর প্রাচীন প্রস্তর	আকিউলিয়ান	হোমো ইরেকটাস
নিম্নতর প্রাচীন প্রস্তর	পাথুরে স্তর	হোমো ইরেকটাস
নিম্নতর প্রাচীন প্রস্তর	স্তরকাটা ছুরির ফলা	হোমো ইরেকটাস বিকশিত আর্কিয় হোমো স্যাপিয়েন্স
মধ্য প্রাচীন প্রস্তর	লেভালোইস	নিয়ানডারথাল
উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর	পিঠওলা ছুরির ফলা	হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স
মধ্যপ্রস্তর	মাইক্রোলিথ	হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স

টীকা ঃ বিভিন্ন প্রজাতিগুলির মধ্যে অনেক ছোটো ছোটো হাতিয়ারের সঙ্গে নানাধরনের আদিম হাতিয়ারের ব্যবহারও চালু থাকতে পারে।

2.3 শারীরিক গঠনে আধুনিক মানুষ

পাকিস্তানের রোহরি পাহাড়ে (উত্তর সিন্ধু) আর সোয়ান উপত্যকায় (পতওয়ার মালভূমি) মধ্য প্রাচীন প্রস্তরযুগের (স্তরকাটা ছুরির ফলা সমেত) যেসব হাতিয়ার প্রচুর পরিমাণে যত্রতত্র পাওয়া যায় তার সূত্র ধরেও প্রাচীনতর সংস্কৃতির এমন কোনো ধারাবাহিকতা অনুমান করতে পারা যায় না। কার্বন-14 পদ্ধতির সাহায্যে পতওয়ার মালভূমিতে এই সংস্কৃতির সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে 60 000 থেকে 20,000 বছর। 5,00,000 বছর আগেকার নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগের সোয়ান সংস্কৃতির সঙ্গে এর কোনো যোগসূত্রই তো নেই। সেক্ষেত্রে আদিকালের যে আধুনিক মানুষ (হোমো স্যাপিয়েনস স্যাপিয়েনস) ভারতবর্ষে ঢুকেছিল, পরবর্তীকালের শিল্পগুলি তারই হাতের কাজ বলে মনে হয়। সেজন্যে, তার সৃষ্টির একেবারে মূলস্তরের দিকে তাকানো এখন খুব জরুরী।

বৈচিত্র্যময় এই প্রাচীন পৃথিবীতে অনেক অনেক দূরদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল হোমো

ইরেকটাস। প্রত্যেকটা দল বা গোষ্ঠী পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাওয়ায় এদের মধ্যে জিন-প্রবাহ একেবারে ঘটলই না বলা যায়। এবার হোমো ইরেকটাসের বিভিন্ন উপ-প্রজাতিতে বিভক্ত হতে শুরু করাটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এদের কখনো কখনো 'আর্কিয় হোমো স্যাপিয়েন্স' হিসেবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। শরীরের ভার কমানোর প্রবণতা বা 'লঘুতা' অত্যন্ত সুদূর প্রসারী হলেও তাকে কোনোমতেই বিশ্বজোড়া বলা যায় না। ইয়োরোপের হোমো ইরেকটাস অধিক জীবনযুদ্ধে বলবান এক প্রজাতি, হোমো স্যাপিয়েন্স নিয়ানডার্থালেনসিস (Homo Sapience Neanderthalensis) বা নিয়ানডার্থাল-মানুষ (চিত্র 2.1গ) উদ্ভূত হল আর 2,30,000 থেকে 30,000 বছরের আগে পর্যন্ত তারা বেড়ে চলল, সমৃদ্ধ হল। 50,000 বছর আগের কোনো সময় থেকেই নিয়ানডার্থাল মানুষেরা পশ্চিম এশিয়া এবং আরো পূর্বদিকে বসতি তৈরি করতে শুরু করেছিল বলে মনে হয়। এই নিয়ানডার্থাল মানুষ আকারে অত্যন্ত ছোটোখাটো। খুবই সরু কপাল, ভুরুর হাড় ওপর দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসা, চিবুক নেই। মগজের খাপটি প্রায় 1,450 ঘন সেমি. আয়তনের; গড় আধুনিক মানুষের তুলনায় এটা অনেক বেশি বড়ো। হাতিয়ার তৈরির ক্ষেত্রে একটু বেশি পরিশীলিত কায়দায় সে কাজ করত। তার নাম লেভালোইস মাউস্টোরিয়ান (Levallois Mousterian)। এর সাহায্যে পাথরের ভেতরের অংশটাকে প্রথমে এমনভাবে ছেঁটে ফেলত যাতে আকারের চাহিদামতো স্তরগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে। এসব কিছু সত্ত্বেও আজকের আধুনিক মানুষের একেবারে বিপরীত অবস্থানে সে বিকশিত হতে লাগল।

শরীর-গঠনের দিক দিয়ে আমরা যাকে আধুনিক মানুষ বলি, তার চিহ্ন হলো, অন্যান্য মানবসদৃশ প্রজাতির সঙ্গে তুলনায় তার কপাল লম্বা হবে, চোখের ওপরে ভারি হাড় সরে যাবে, মুখে থাকবে একটা উল্লম্ব রেখা (বাইরের দিকে ঢালু হয়ে যাওয়া রেখার তুলনায়) আর চিবুক (চিত্র 2.1ঘ)। তার হাড়গুলো হবে পাতলা অর্থাৎ 'বলবান' হবার বদলে সে হবে 'ছিপছিপে'। আমাদের প্রজাতি যে প্রথমে আফ্রিকায় উদ্ভূত হয়েছিল আর তারপর ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্বে, এমন অনুমানের সপক্ষে অনেক ভালো ভালো যুক্তি আছে। অন্যান্য মানব বসতির তুলনায় আফ্রিকার সাহারায় মানুষজনের মধ্যে জিনগত বৈচিত্র্য অনেক বেশি আর এর থেকেই এমন একটা আন্দাজ করা যায় যে, হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স হিসেবে তুলনামূলকভাবে অনেক সুদীর্ঘকাল পেরিয়ে আসার জন্যে অন্যান্য অংশের মনুষ্যবসতির তুলনায় তাদের জিনে অনেক বেশি ক্রমবিবর্তন ঘটে গেছে। পুরাতাত্ত্বিক সন্ধানে একথা প্রতিষ্ঠিত যে, আফ্রিকায় হোমো ইরেকটাসের ক্রমপরিবর্তন ঘটেছিল কয়েকটি স্তরে। ইথিওপিয়ার আফার-এ (14 লক্ষ থেকে 6 লক্ষ বছর আগে) যে হোমো ইরেকটাস পাওয়া গেছে তার মধ্যে আধুনিক মানুষের অনেক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তারপর 2 লক্ষ বছর আগের সময়কালে দক্ষিণ আফ্রিকার এলান্ডসফনটেন (Elandsfontein)-এ আকিউলিয়ান হস্তশিল্পের সঙ্গে

সংক্ষিপ্ত রূপ

প্রজাতি

H. habilis হোমো হাবিলিস

H. Erectus হোমো ইরেকটাস

Neander হোমো স্যাপিয়েন্স নিয়ানডার্থালেনসিস

H. Sap.

Sap. হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স (শারীরিক গঠনে আধুনিক মানুষ)

টীকা অঞ্চলগুলিতে যখন জীবাশ্ম-কঙ্কাল বা তার অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায় তখনি কেবল প্রজাতিগুলিতে নির্দিষ্ট করা যায়

প্রসঙ্গ

হাতিয়ার সমূহের শ্রেণীবিভাগ

(A) ওলডোয়ান

(B) স্তরকাটা নুড়িপাথর

(C) আকিউলিয়ান

(D) স্তরকাটা পাথরের ছুরি

(E) লেভালোইস

(F) পিঠওয়ালা ছুরি

(G) মাইক্রোলিথ

তীরচিহ্নে হোমো স্যাপিয়েন্সের অভিবাসনের সম্ভাব্য রেখা দেখানো হয়েছে

সংখ্যায় কত বছর আগে তার হিসেব

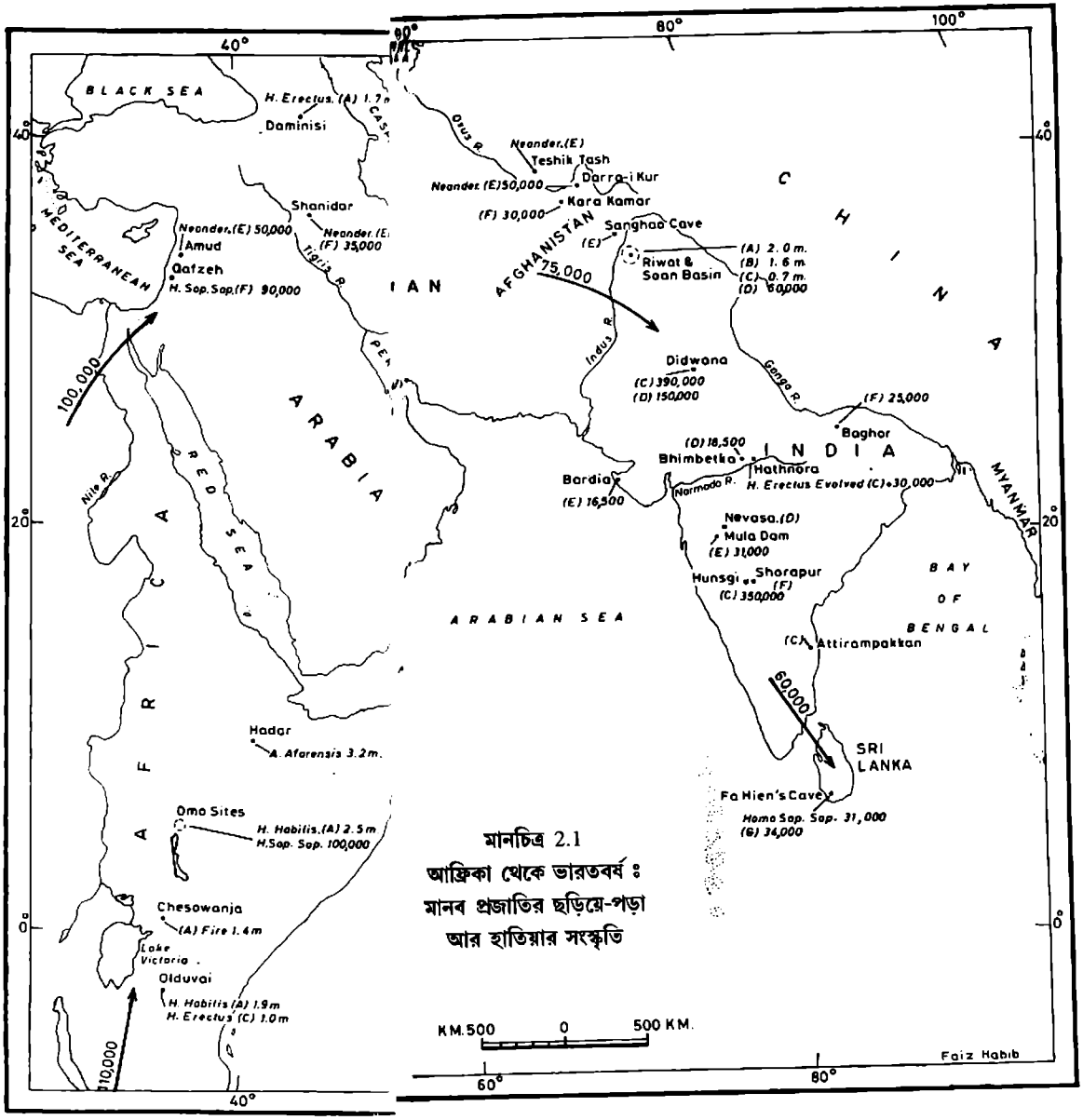

মানচিত্র 2.1
আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষ ঃ মানব প্রজাতির ছড়িয়ে-পড়া আর হাতিয়ার সংস্কৃতি

আবির্ভূত হলো আর্কিয় হোমোস্যাপিয়েন্স-এর একটি গোষ্ঠী। 1,20,000 বছর আগে দেখা দিল এর আরো অনেক বেশি বিকশিত একটি রূপ; অপেক্ষাকৃত ছোটো ছোটো হাতিয়ার বিশেষত যাকে বলা হয় আফ্রিকার মধ্য প্রস্তর যুগের (Middle Stone Age-MSA) শিল্প সেই স্তরকাটা ছুরির ফলা তৈরি করতে আর তাকে কাজে লাগাতে এই গোষ্ঠী যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ ছিল।

জিনবিশেষজ্ঞদের অনুমানে প্রায় 2,00,000 বছর আগে এই প্রজাতি (10,000 বা তারও বেশি লোকের একটি অন্তপ্রজননকারী জনগোষ্ঠী সমেত) তার মূল গঠনটি পেয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার পুরাতাত্ত্বিক রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে শরীর গঠনের বিচারে আজকের আধুনিক মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় 1 লক্ষ 15 হাজার বছর আগে। প্রথমদিকে এই আধুনিক মানুষের সঙ্গে মধ্য

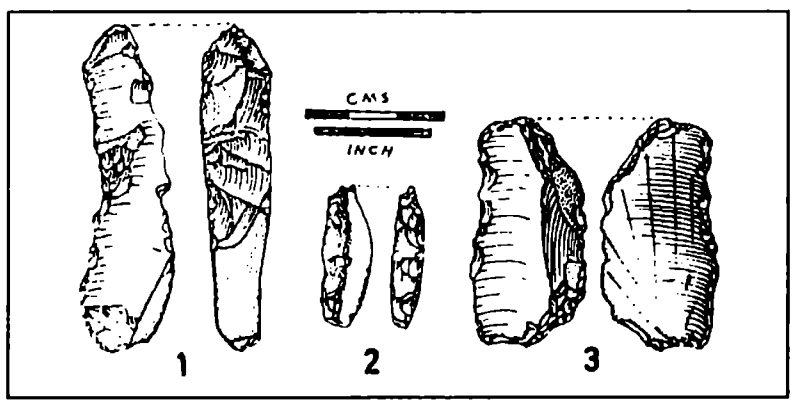

চিত্র 2.7 শোরাপুর দোয়াব থেকে পিঠওয়ালা ছুরির ফলা (কর্ণাটক)
নং 2 ক্ষুদ্র আকার লক্ষ্যণীয় (কে. পাড্ডাইয়া অনুসরণে)

প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের একটা যোগ ছিল বটে, কিন্তু তারপর (প্রায় 90,000 বছর আগে) তাদের আরো পাতলা দু'ধারওলা প্রিজমের গড়নের তিনকোণা পাত বা যাকে বলে পিঠওলা ছুরির ফলা' (backed blades) তৈরি করতে দেখা গেল (2.7 নং ছবি দেখতে হবে)। সমান্তরাল ধার সমেত পিঠওলা (backed) ছুরির ফলা-কে অবশ্যই একান্তভাবে আধুনিক মানুষের হাতিয়ার বলে মনে করা হয়। আলাদা আলাদা কাজের জন্য এটা দিয়ে সে এখন আলাদা আলাদা বিচিত্র সব পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে পারল; এমনকি পশুর হাড় আর শিং থেকেও গড়তে পারল হাতিয়ার, অলংকার। এরই সঙ্গে সঙ্গে যেকোনো প্রাচীন করণ-কৌশলও তৎক্ষণাৎ সে গ্রহণ করল কিংবা এর সঙ্গে মিলিয়ে নিল; তা সে হাতিয়ার লেভালোইস মাউস্টেরিয়ান কিংবা আর্কিয়ান কিংবা

স্তরকাটা নুড়ি পাথরের (Pebble-Flake) যারই হোক না কেন, যার সঙ্গে তার পরিচয় হল সেটাই সে আত্মস্থ করল।

শরীর-গঠনের দিক থেকে, হোমো ইরেকটাসের চেয়ে কথা বলার ব্যাপারে সে অনেক বেশি দক্ষ ছিল কিনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই, কিন্তু সে যে এখন অনেক বেশি নানা ধরনের আওয়াজ করতে পারত তা হতে পারে। তখনও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভবত কণ্ঠস্বরের অভাব পূরণ করে দিত অঙ্গভঙ্গি, শিস, শ্বাসের ওঠাপড়া, ঘোঁত ঘোঁত শব্দ বা ঐ রকম আরো সব আওয়াজ। এটা ঘটনা যে, এতো সুদীর্ঘকালের বিচ্ছিন্নতা, বিশেষত অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্ন সময়কাল লক্ষ্যনীয় মাত্রায় দীর্ঘ— 60,000 বছরেরও বেশি, তা সত্ত্বেও পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের মানব প্রজাতিকে যে এক বা অন্য যে কোনো ধরনের ভাষার পূর্ণ অধিকারী হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, আফ্রিকা থেকে আধুনিক মানুষের ছড়িয়ে-পড়া শুরু হবার আগেই ধ্বনি নিয়ে অভিব্যক্তি প্রকাশ সে রপ্ত করেছিল। ভাষা তাকে দিল এক দুরন্ত ক্ষমতা, তার পাশের মানুষটির সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষমতা; তাতে একজনের থেকে অন্যজনে দক্ষতার ঠাঁই বদলে জোর সুবিধে। আগে থেকে ঠিক-করে-নেওয়া জটিল কোন কাজ কত সহজে একসাথে করা সম্ভব। তার ওপর অনেক কথা যখন মনে তোলপাড় করে, তখন ভাবনাগুলো ঠিকমতো সাজাবার জন্যে অনেক বেশি সুবিধাজনক একটা বাহন পাওয়া, সে বড়ো কম কথা নয়।

2.4 ভারতবর্ষে আধুনিক মানুষ

আফ্রিকা থেকে আধুনিক মানুষের খুব দ্রুত ছড়িয়ে-পড়ার সাক্ষ্য বহন করে মানব-কঙ্কালের ভগ্নাবশেষ (এখনও জীবাশ্মেই); পিঠ-ওলা ছুরির কারিগরি সমেত তাকে পাওয়া যায় পশ্চিম এশিয়ায় 90,000 বছর আগে। এশিয়ায় ঘুরতে ঘুরতে 60,000 বছরেরও আগে সে পৌঁছে গেলো অস্ট্রেলিয়ায়, ঢুকে পড়লো সাইবেরিয়া আর আলাস্কার নবীন জগতে; সম্ভবত আজ থেকে 20,000 বছরের বেশি দেরিতে নয় সেটা। আফ্রিকা থেকে তার এই ভ্রাম্যমানতার মাঝপথে যেহেতু ভারতবর্ষের সীমানারেখা, কাজেই আজ থেকে 60,000 বছরের চেয়ে অনেক আগেই সে ভারত উপমহাদেশের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছিল হয়তো। পরবর্তী 20,000 বছরের মধ্যে সে ভারতবর্ষ পার হয়ে নিশ্চয়ই শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছিল, কেননা শ্রীলঙ্কার ফা-হিয়েন গুহায় 31,000 বছর আগেকার সময়ে আধুনিক মানুষের শিলীভূত কঙ্কাল (তার মধ্যে একটি শিশুও আছে) দেখতে পাওয়া গেছে, অথচ ঐ অঞ্চলে মানব-অধিকারের চিহ্ন আরো পুরোনো, প্রায় 34,000 বছর আগের। শ্রীলঙ্কার বাটাডোমবা লেনা (Batadomba Lena) গুহাতেও 28,500 বছরের পুরোনো মানব-কঙ্কালের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। আমাদের মনে থাকার কথা (1.2 নং অধ্যায়) যে, প্রায় 30,000 বছর আগে যদিও সমুদ্র

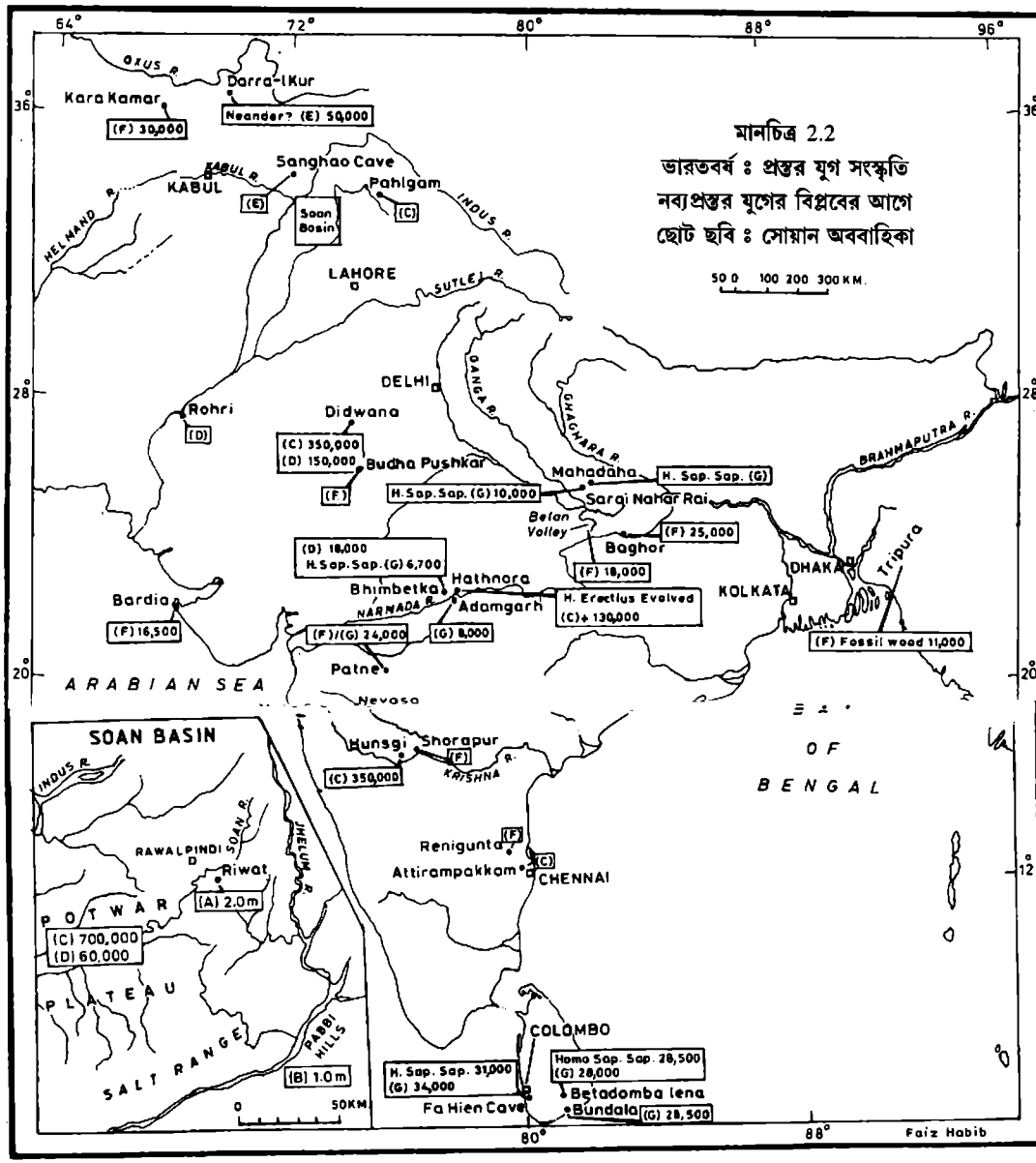

সংক্ষিপ্ত রূপ; *প্রজাতি*

H. habilis হোমো হাবিলিস; H. Erectus হোমো ইরেকটাস; Neander হোমো স্যাপিয়েন্স নিয়ানডার্থালেনসিস; H. Sap. Sap. হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স (শারীরিক গঠনে আধুনিক মানুষ)

টীকা অঞ্চলগুলিতে যখন জীবাশ্ম-কঙ্কাল বা তার অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায় তখনি কেবল প্রজাতিগুলিতে নির্দিষ্ট করা যায়

প্রসঙ্গ

হাতিয়ার সমূহের শ্রেণীবিভাগ

(A) ওলডোয়ান; (B) স্তরকাটা নুড়িপাথর; (C) আকিউলিয়ান; (D) স্তরকাটা নুড়িপাথরের ছুরি; (E) লেভালোইস; (F) পিঠওয়ালা ছুরি; (G) মাইক্রোলিথ তীরচিহ্নে হোমো স্যাপিয়েন্সের অভিবাসনের সম্ভাব্য রেখা দেখানো হয়েছে সংখ্যায় কত বছর আগে তার হিসেব

জেগে উঠেছে, কিন্তু তারও আগে, হিমায়নের প্রাচীনতর দশায় (50,000 বছর বা তারও অনেক আগে) সমুদ্রতল নেমে যাবার সময়কালে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সরাসরি একটা স্থলভাগের সেতু ছিল।

এশিয়া পার হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় দেশান্তরী হবার পূর্ব-সূত্র ধরে আমরা যদি আধুনিক মানুষের প্রথম আগমনকে সাজাই, তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতবর্ষের সীমান্তরেখায় যে আধুনিক মানুষ পৌঁছেছিল তারা পিঠওলা ছুরি শিল্পকৌশলের অধিকারী ছিল না, কেননা তারা তো অস্ট্রেলিয়া থেকে সেগুলো নিয়ে আসতে পারেনি। পাকিস্তানের সোয়ান অববাহিকার মধ্য প্রাচীন প্রস্তর-যুগ সংস্কৃতির (60,000 থেকে 20,000 বছর আগে) স্রষ্টা যে আধুনিক মানুষ তার কৃতির মধ্যে পিঠওলা ছুরি উপস্থিত ছিল না। এই সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে, বিশেষত রোহরি পর্বতাঞ্চলে, হাতিয়ার এবং অন্যান্য ভাঙাচোরা সামগ্রীর যে স্তূপ পাওয়া যায় তার থেকে যে সমাজচিত্র ফুটে ওঠে তা হলো, কয়েকটি দল সমতলে, বনেজঙ্গলে, সংকীর্ণ গিরিসংকটে শিকার করে বেড়াচ্ছে আর হাতিয়ার তৈরিতে বিশেষভাবে দক্ষ আরেক দল রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানকার পাথরখাদ থেকে অনেক ভালো ভালো, উপযোগী পাথর তোলা যায় সেখানকার 'কারখানা'-তে। তাহলে এ থেকেই অনুমান করা যায়, একটা মোটা দাগের শ্রমবিভাজন আর বিনিময়-প্রথা তখনি চালু হয়ে গিয়েছিল।

প্রচলিত পর্যায়ক্রমে, যেখানে উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের রয়েছে পিঠওলা ছুরি শিল্প আর মাইক্রোলিথ-এ রয়েছে মধ্যপ্রস্তর যুগের চিহ্ন, দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে সেটা কেমন ঝাপসা ধোঁয়াটে লাগে, কেননা এমন কোনো পরিষ্কার স্তরবিভাজনে সেখানকার পর্যায়ক্রমটি প্রতিষ্ঠিত নয়। শ্রীলঙ্কায় মাইক্রোলিথ বা ছোটে ছোট পাথরের হাতিয়ার যেসময় প্রথম দেখা গেল, সেই 34,000 বছর আগেও সেখানে কোথাও উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের কোনো এলাকা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যুক্তির বিচারে এই দুই করণকৌশলের ক্রমপর্যায় এতো সুস্পষ্ট যে, আগে হাতিয়ার তৈরি করার যন্ত্র পিঠওলা ছুরির ব্যবহার না করেই ছোট ছোট পাথরের সামগ্রী তৈরি করে ফেলা গেল এরকম কল্পনা করা খুবই অসম্ভব। কাজেই ভারতবর্ষে এখন যত প্রাচীন পিঠওলা ছুরির সম্ভার পাওয়া গেছে, আরও বেশি বেশি অনুসন্ধান করলে তার চেয়ে অনেক পুরোনো কালের এইরকম সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া যাবে এমন কথা নিশ্চয়ই আমরা ভাবতে পারি।

অন্ধ্রপ্রদেশের চিতোর জেলার রেনিগুন্টাতে যে উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের অঞ্চল কিংবা কর্ণাটকের শোরাপুর দোয়াবে অবস্থিত অঞ্চল (শোরাপুর দোয়াব অঞ্চলের হস্তশিল্পের জন্য 2.7 নং চিত্র দেখতে হবে) কিংবা রাজস্থানের বুদ্ধপুস্কর থেকে পাওয়া পিঠওলা ছুরির ফলা— এসব কিছুর সঙ্গে সেই অনেক পুরোনো সময়ের একটা যোগ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তাদের সত্যিকারের বয়স যে কি সে বিষয়ে এখন খুব সামান্য কিছুই বলা যায়। মধ্য ভারতে, আমরা পেয়েছি উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের দুটো প্রধান

এলাকা— বাঘোর-1-এর 25,500 থেকে 10,500 বছর আগের সংস্কৃতি আর বেলান উপত্যকার 18,000 থেকে 16,000 বছর আগের সংস্কৃতি। বাঘোর-1 বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ একটা অঞ্চল শোন উপত্যকার একেবারে মাঝখানে তার অবস্থান;এ এমন এক অঞ্চল যেখানে পাথরের হাতিয়ার, যার মধ্যে রয়েছে পিঠওলা ছুরির ফলা, বিষমভূজ ত্রিভুজ, তুরপুন, র‍্যাঁদা, এসব বিপুল পরিমাণে তৈরি হতো। সেখানে যেহেতু মাটির ওপরে বালিপাথরের একটা আলগা চাতালের মতো আছে যার কেন্দ্রে নানা রঙের আভাসে উদ্ভাসিত এক খণ্ড লৌহময় (ferruginous) বালিপাথর, দেখতে যেন এক দেবমূর্তি, তাই সে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে কত সংস্কার (এ বুঝি মানুষের এক বিশেষ গুণ!)।

আধুনিক মানবগোষ্ঠী একই সঙ্গে মায়ানমারের দিক থেকেও পূর্বভারতে দেশান্তরী হতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। শিলীভূত গাছে তৈরি হস্তশিল্পকৃতি, তার মধ্যে পিঠওলা ছুরির ফলাও রয়েছে, প্রায় 11,000 থেকে 4,500 বছর আগেকার এসব সামগ্রী

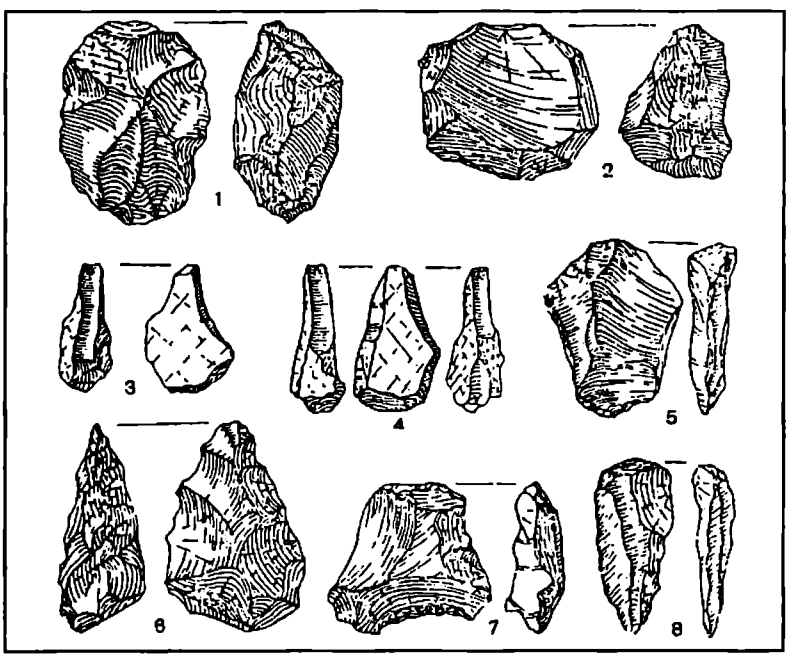

চিত্র 2.8 পাকিস্তানের সিংঘাও গুহার শিল্পকৃতি। নং 1 'নেভালোইস' পদ্ধতিতে তৈরি একটা পাথরের ভেতরের অংশ যার থেকে পাতগুলো বার করে, নেওয়া হয়নি; নং 2 পাথরের ভেতরের অংশ যার থেকে পাতগুলো বের করে নেওয়া হয়েছে। বাকী গুলো পাত থেকে তৈরি নানান হাতিয়ার (বি. এবং আর অলচিন অনুসরণে)

পাওয়া গেছে ত্রিপুরায়, পূর্ব বাংলাদেশে। পরবর্তী দশায় এটি মায়ানমারের উচ্চ ইরাবতী উপত্যকার তথাকথিত প্রাচীন প্রস্তর যুগের 'আন্নাথিয়ান' শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ভারতবর্ষে আগমনকালে এই নতুন প্রজাতি কি অন্য মানব প্রজাতির সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল? যুক্তির সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। যে লেভালোইস মাউস্টেরিয়ান হাতিয়ারের (পাথরের মূল অংশটিকে আকার দেওয়া কিংবা আকাঙ্ক্ষিত আকার দিতে পারে এমন যন্ত্র তৈরি করা) সঙ্গে নিয়ানডার্থালদের যোগাযোগ সেগুলো পাওয়া গেছে আফগানিস্তানের দারা-ই-কুর (50,000 বছর আগের) এবং কারা কামারে (30,000 বছর আগের) আর পাকিস্তানের সাংঘাও গুহাতে (2.8 নং ছবি)। উজবেকিস্তানের টেসিক টাস যেখানে নিয়ানডার্থাল-করোটি পাওয়া গেছে সেখান থেকে ঐ জায়গাগুলো বেশি দূরে নয়। একটা করোটি পাওয়া গেছে দারা-ই-কুরে; সে 'খানিকটা' নিয়ানডার্থাল জনসমষ্টির একজন সদস্য হলেও হতে পারে। মহারাষ্ট্রের মুলাবাঁধ (31,000 বছর আগের), গুজরাটের বরদিয়া (1,500 বছর আগের) আর ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে পাওয়া একই রকমের মাউস্টেরিয়ান হাতিয়ার যদি নিয়ানডার্থালের হাতের কাজ না হয়, তবে উত্তর-পশ্চিমের এই মানুষদের কাছ থেকে আধুনিক মানুষ সেই কৌশল শিখেছিল এবং সেটা ভারতবর্ষে এনেছিল, এমন হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে অবশ্যই অন্তর্প্রজনন ঘটেছিল তাদের, যেমন হয়েছিল পশ্চিম এশিয়ায়, সেখানের কালমধ্যবর্তী হাড়ের কাঠামোর গঠন বিচার করে তা বোঝা যায়। এই একইরকম অন্তর্প্রজনন ঘটেছিল আধুনিক মানুষ আর টিকে থাকা হোমো ইরেকটাস গোষ্ঠীর মধ্যে, আর আবারও তা ঘটেছিল ইন্দোনেশিয়ার জাভায়, Ngandang-এ 53,000 থেকে 27,000 বছর আগে। এখন উত্তর পশ্চিম শ্রীলঙ্কার উপকূলবর্তী একটু কম পুরোনো মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগের স্রষ্টা (74,000-28,000 বছর আগে) যদি হয় পরের দিকের হোমো ইরেকটাস; আর অন্যদিকে কঙ্কালের ভগ্নাবশেষ থেকে যেমন আমরা জানি, সেই মতো দক্ষিণ শ্রীলঙ্কায় 34,000 বছর আগে যে মানুষ ছোট ছোট পাথরের হাতিয়ার তৈরি করত, নির্ভুলভাবে সে যদি হয় আধুনিক মানুষ, তবে তো শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটেছিল এমন কথাই ভাবতে হবে (কিন্তু শ্রীলঙ্কায় যদি 60,000 বছর আগে আধুনিক মানুষ পৌঁছেই গিয়ে থাকে তবে সে অন্যান্য সংস্কৃতিরও স্রষ্টা হতে পারত)। সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রজাতিগুলিকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল একথা মেনে নিতে হবে, মেনে নিতে যে, যারা শ্রেষ্ঠ (আমাদের লোকজন!) তারা বাধাদানে অসমর্থ অন্যদের হত্যা করেছিল। এইভাবে শরীর-গঠনে আধুনিক মানুষ নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এবং সরিয়ে দিয়ে দুভাবেই কেবল ভারতবর্ষ থেকে নয় সারা পৃথিবী থেকে পুরোনো মানব প্রজাতিকে একেবারে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে আমাদের যদি অন্তর্প্রজনন ঘটেই থাকে তবে সেই প্রাচীনতর

প্রজাতি আমাদের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্যের কোনো ছাপ যে কেন রেখে গেল না এ প্রশ্ন অনেক বিতর্ককে উসকে দিয়েছে। পূর্ব এশিয়ার বর্তমানের মঙ্গোলীয় আর অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রোলয়েডদের মধ্যে স্থানীয় হোমো ইরেকটাসের কিছু কিছু অপ্রধান শারীরিক বৈশিষ্ট্য এখনো টিকে আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু তাদের এই ক্ষুদ্র 'জাতিগত' পার্থক্য, আর পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মানুষের থেকে অস্ট্রেলীয় এবং আমেরিন্ডিয়ান জনসমষ্টির বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও, বর্তমানের মানবজাতি জৈবিকভাবে অত্যন্ত সমজাতীয় এক প্রজাতি। পশ্চিম ইওরোপে একেবারে পাশাপাশি বাস করত আধুনিক মানুষ আর নিয়ানডার্থালরা; সে তো খুব বেশিদিনের কথা নয়, 10,000 বছর আগে-পরে। অথচ নিয়ানডার্থালের সাম্প্রতিক জিন-নিষ্কাশন থেকে ইওরোপের জিন ভাণ্ডারে নিয়ানডার্থালের কোনো বিশিষ্ট অবদান রয়েছে এমন কোনো খবর প্রকাশিত হয়নি। এর থেকে নিশ্চিতভাবে একটা অনুমানই করা যায় যে, অপরাপর প্রজাতির সঙ্গে সংযোগের সময়কালে, আধুনিক মানুষের জনসংখ্যা গুনতিতে এতো বিপুল হয়ে গিয়েছিল যে, অন্য কোনো কম জনসংখ্যার জাতি বা প্রজাতির থেকে আসা জিন-প্রবাহ খুব তাড়াতাড়ি তার তাৎপর্য হারিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

2.5 মধ্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি

আরো বেশি দক্ষ, হালকা কাজের হাতিয়ার আর সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত ভাষণে পরস্পরের মধ্যে ভাব আর তথ্য বিনিময় করার আরো বেশি দক্ষতা— এর থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা ক্রমশ গুণতিতে বেড়ে গিয়েও সেই বিশাল জনসমষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার এমন ক্ষমতা পেয়েছিল। সম্মিলিত উদ্যোগে জন্তু শিকারে ঐ দুটোই তাদের খুব কাজে লাগত। পরিবর্তনের গতি যেভাবে বেড়ে গেল, তা ঐ বিপুল সম্ভাবনার প্রতিফলনেই পাওয়া। হাতিয়ারের উপাদানে বৈচিত্র্য এল। কেবল পশুর হাড় নয়, তারই সঙ্গে পশুর শিং, কাঠ (বিশেষভাবে চীন আর দক্ষিণ-এশিয়ায়) আর বাঁশ— এসবের ব্যবহার যত বাড়ল ততই এমন একটা পরিবর্তন সফল হয়ে উঠতে পারল। কিন্তু জৈব উপাদান তো আর বেশিদিন টিকে থাকে না। তাই আমাদের সেই পুরোনোকালের হাতিয়ার-ভাণ্ডারে বেশিরভাগই ছিল পাথরের হাতিয়ার। কিন্তু তাদের ক্রমোন্নতি ঘটাতে আগে যেখানে কয়েকশ' হাজার বছর লাগছিল, পরে সেটা এই কয়েকটা দশ হাজার বছরের মধ্যেই হয়ে গেল, আর তারপর আরও কম সময়ে, মাত্র কয়েক হাজার বছরেই। প্রথমে আমরা একটা রূপান্তর পেলাম মাক্রোলিথ-এর মধ্যে (ছোটো ছোটো পাথরের হাতিয়ার আর সূচালো মুখ, প্রায়ই সেটা ছুরির ফলার আগায় থাকে, সম্ভবত কাঠের কিংবা হাড়ের হাতলে আটকে ব্যবহার করা হতো, 2.9 নং ছবি দেখতে হবে) ছুরির ফলার কৌশলে। এতে 70 হাজার বা ঐরকম কিছু সময় (1,00,000 থেকে 30,000 বছর আগে) লেগেছিল, আর তারপর এই ঘটনা থেকে নিওলিথিক বা নব্য প্রস্তর

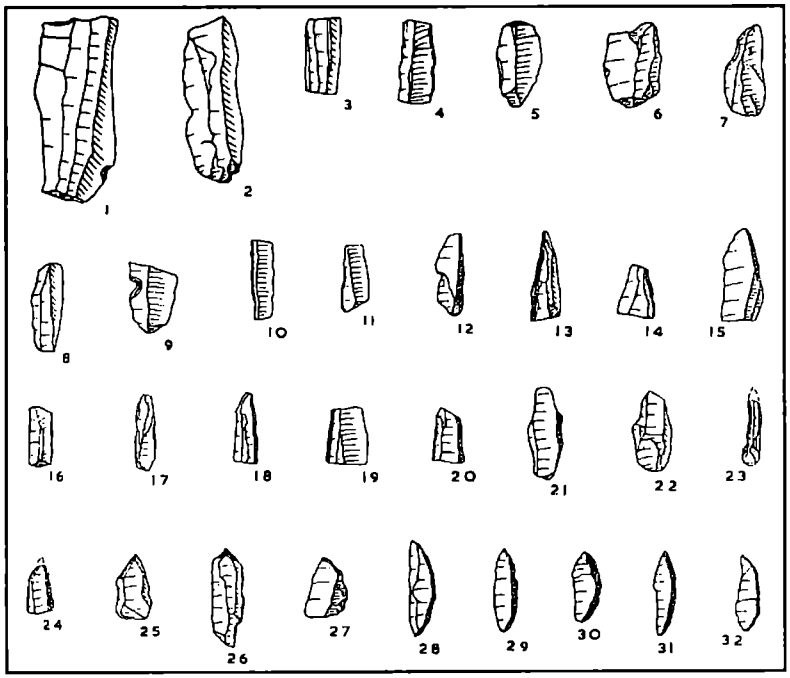

চিত্র 2.9 মহাদহার মাইক্রোলিথ নং 1 থেকে 9 সমান্তরাল ধারওয়ালা ছুরি; নং 10 থেকে 21 ভোঁতা পিঠওয়ালা ছুরি; নং 22 থেকে 25, সূচালো; নং 26 থেকে 27, burins; নং 28 থেকে 32 অর্ধচন্দ্রাকৃতি (জি আর শর্মা অনুসরণে)

যুগের সূচনা পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত কম সময় পার হল, 25,000 বছর বা ঐরকম কিছু (34,000 বছরের কিছুটা বেশি থেকে 9,000 বছর আগের সময়)।

মাইক্রোলিথ দিয়ে চিহ্নিত এই ক্রান্তিকালকে মেসোলিথিক বা মধ্য প্রস্তর যুগ বলা হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাচীনতম মাইক্রোলিথ পাওয়া গেল শ্রীলঙ্কায়, সেখানকার ফাহিয়েন গুহায় যেখানে সরল মাইক্রোলিথ 34,000 বছর আগেকার আর বাটাডোমবা লেনা-তে জ্যামিতিক মাইক্রোলিথ 28,000 বছর আগের। মহারাষ্ট্রের ছালিসগাঁও-এর কাছাকাছি পাটনে-তে উচ্চ প্রাচীন-প্রস্তর-যুগের হাতিয়ার সমেত কয়েকটি মাইক্রোলিথ দেখা গিয়েছিল (প্রায় 24,000 বছর আগে)। তাহলে, শ্রীলঙ্কা থেকে মাইক্রোলিথিক কলাকৌশল উত্তরমুখে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল কি? তারপর যাযাবর গোষ্ঠীর পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো মানবগোষ্ঠী— সাময়িক আস্তানার জন্যে খুঁজতো গুহা, পাথুরে আশ্রয়, ছোট পাহাড়ের ঢিবি কিংবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক অঞ্চল— কিছুটা সুস্থিত জনগোষ্ঠী মাথা গুঁজতো কুঁড়েতে। শ্রীলঙ্কার বেলি লেনা-র মধ্যপ্রস্তর যুগের অঞ্চল

চিত্র 2.10 মহাদহা থেকে পাওয়া সমাধিস্থ নারীর করোটি
(জি. আর. শর্মা অনুসরণে)

থেকে প্রায় 12,000 থেকে 9,000 বছর আগেকার (10,000 এবং 7,000 খ্রী পূ) যে পোড়া জোয়ার-দানার সাক্ষ্য পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে, ততদিনে খাদ্য হিসেবে বুনো শস্যকণার সংগ্রহ শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগে, ধর্মীয় বিশ্বাস আর মূর্তির প্রতীকী প্রতিনিধিত্বের সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে বাঘোর-১ অঞ্চলে, সে আমরা দেখেছি। মধ্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতিতে এইরকম ধর্মীয় 'প্রতীক' পাওয়া গেছে অলংকারে, সম্ভবত কবচ হিসেবেই যেগুলো পরা হতো আর তাছাড়া পাথরের ওপর রয়েছে হিজিবিজি সাংকেতিক প্রতীক। শেষেরটি বিকশিত হয়েছিল পাহাড় বা গুহা-শিল্পে।

পরবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ মধ্যপ্রস্তর যুগের অঞ্চলের মধ্যে উত্তর প্রদেশের

মধ্যাঞ্চলের সমভূমিতে অবস্থিত সারাই নাহার রাই আর মহাদহা পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেষি করে রয়েছে। রেডিও-কার্বন পদ্ধতিতে সারাই নাহার রাই-এর বয়স প্রায় দশহাজার বছর (8,000 খ্রী পূ)। এই অঞ্চলগুলো চেহারা পাল্টে সমাধিক্ষেত্র হয়ে গেল— সেখানে লম্বা, (গড় বয়স্ক উচ্চতা পুরুষ 180 সেমি আর নারী 170 সেমি-এর বেশি) দীর্ঘ হাড়ওয়ালা, বরং একটু শক্তপোক্ত জনসমষ্টির করোটি পাওয়া গেছে (ছবি নং 2-10)। হাতিয়ারের প্রকারভেদ তখন বহুগুণ বিবর্ধিত, কিন্তু তবুও সমান্তরাল-ধার ছুরির ফলার ওপরেই তাদের নির্ভরতা (চিত্র 2.9)। হাড় কিংবা চকমকি পাথর দিয়ে তৈরি করা তীরের আগা আর কোনো একটা কঙ্কালের পাঁজরের সেই পাথরের আঘাত, এর থেকে বোঝাই যায় যে, শিকারীদের হাতিয়ারে তখন তীর-ধনুক জায়গা পেয়ে গেছে। যেসব পশু শিকার করা হত এবং খাওয়া হতো তাদের মধ্যে জেবু বা কুঁজওলা ভারতীয় ষাঁড়, মোষ, ভেড়া, ছাগল, পুরুষ-হরিণ, শুয়োর, গণ্ডার, হাতি, কচ্ছপ, বুনো ঘুঘু আর অন্যান্য সব পাখিও রয়েছে। গবাদি পশু বা ভেড়া কিংবা ছাগল, এরা যে গৃহপালিত হয়ে গেছে এমন কোনো জোরদার প্রমাণ নেই ঃ অরণ্যের মধ্যেই বসতি ছিল আর শিকার হওয়া যেসব পশু পাওয়া গেছে তারা সবাই ছিল বুনো। মাংস ঝলসানোর কাজে আগুন ব্যবহার করা হত এমন প্রমাণ আছে। পাথরের জাঁতা আর

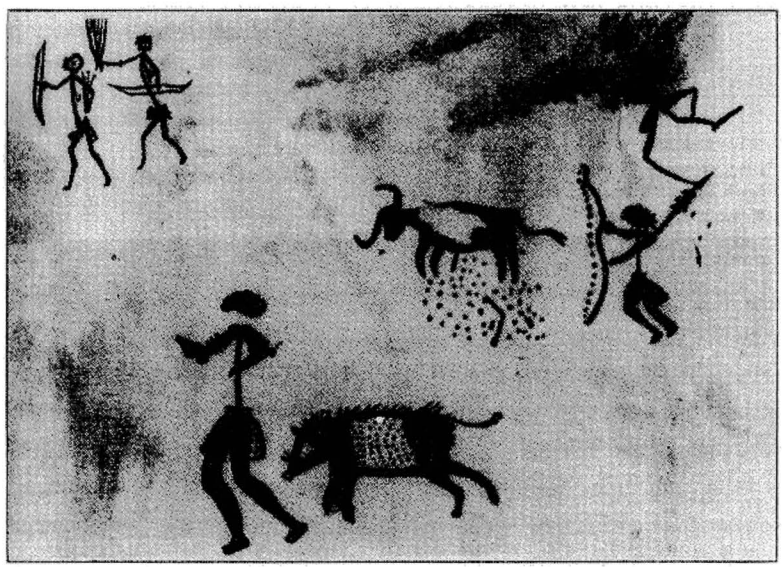

চিত্র 2.11 'অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম' ভীমবেটকা, III C-18/a
(ওয়াই মথপালের পুনরুৎপাদিত)

চিত্র 2.12 বোঝা মাথায় নারী, ভীমবেটকা II F-8 (ওয়াই মথপালের পুনরুৎপাদিত)

হামানদিস্তা (muller) যেহেতু পাওয়া গেছে কাজেই বীজ সংগ্রহ করা হত আর পেষাই করাও হত। এসব ক্রিয়া-পদ্ধতি দেখে মনে হয় নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের জন্যও বীজ সংগ্রহ করা হত। কিন্তু চাষ-বাস শুরু হয়নি তখনো। পরবার জন্য সূতীর কাপড় ছিল না, সম্ভবত পশুছালের টুকরো পরা হত। চুল থেকে হাতে দড়ি পাকানো হতো, কিন্তু বোনা হত এমন কোনো প্রমাণ নেই। তখন পর্যন্ত কুমোরের কাজও শুরু হয়নি। মহাদহায় হাড়ের অলংকার (লকেট আর নেকলেস) পাওয়া গেছে, তবে দেখা যাচ্ছে পুরুষেরাই কেবল পরতো নারীরা নয়।

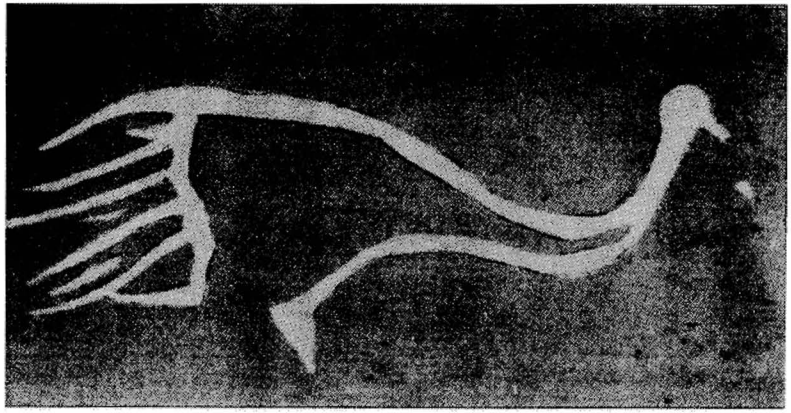

চিত্র 2.13 ময়ূরী, ভীমবেটকা III C-6 (ওয়াই মথপালের পুনরুৎপাদিত)

তখনো পর্যন্ত মানুষের জীবনযাপন ছিল ভীষণ, ভীষণ কঠিন। মহাদহায় সমাধিস্থ তেরোজন মানুষের বয়স নির্ণয় করা হয়েছে, তাদের সবার বয়স 19 থেকে 28 বছরের মধ্যে, সম্ভবত বেশিরভাগই উনিশের কাছাকাছি। একজন মাত্র চল্লিশের ওপরে, পঞ্চাশের ওপরে কেউ নেই।

ধর্ম আর কুসংস্কারের অস্তিত্ব যে ছিল তার সংকেত রয়েছে সমাধিস্থ-করার ঘটনায়। মৃতের সঙ্গে হাড়ের অলংকার আর শিকার করা পশুর হাড়ও মাটিতে পোঁতা হয়েছে দেখে বোঝা যায় মৃত্যু-পরবর্তী কোনো জীবনেও তাদের বিশ্বাস ছিল। পুরুষের মতো নারীদেরও একইরকমভাবে মাটিতে গোর দেওয়া হয়েছে; যুগ্ম সমাধি আছে যদিও, কিন্তু পরলোকে একজনকে সঙ্গ দেবার জন্যে যে অপরজনকে হত্যা করা হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই সেখানে। বেলান উপত্যকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে হাড়ের একটা ছোট্ট মূর্ত্তি আর মহারাষ্ট্রের পাটনে ও মধ্যপ্রদেশের রোজড়ে থেকে নকশা কাটা অস্ট্রিচের (শিকার হতে হতে অনেকদিন হলো ভারতবর্ষ থেকে এর অস্তিত্ব মুছে গেছে) ছাল। শুধুমাত্র নান্দনিক উদ্দেশ্যে সম্ভবত এটা করা হয়নি, বরং এর পেছনে একটা ধর্মীয় আচারের তাৎপর্য কিংবা কুসংস্কার দুই-ই আছে।

নর্মদা উপত্যকায় আদমগড়ে কুকুর, ষাঁড় (জেবু), গোরুবাছুর, মোষ; ভেড়া, শুয়োর এইসব গৃহপালিত পশুর সঙ্গে সমান সংখ্যায় হরিণ, শজারু, গিরগিটি-র মতো বুনো জন্তুর হাড় প্রায় 8,000 বছর আগেকার (6,000 খ্রী পূ) আর একটু উন্নত মধ্যপ্রস্তর যুগ সংস্কৃতির কথা জানায়। স্পষ্টত এরা ছিল অংশত পশুপালক হয়ে ওঠা এক শিকারী গোষ্ঠী। তখনো সমান্তরাল-ধারওলা ছুরির ফলা দিয়েই তাদের হাতিয়ার গড়া কিন্তু তাতে অসংখ্য বৈচিত্র্য— তুরপুণ আছে, বেঁধার যন্ত্র এমনকি খোদাই-যন্ত্রও রয়েছে।

হাতে তৈরি মাটির সামগ্রীও ছিল। পাহাড়ের আশ্রয়ে থাকতো তারা, আর সম্ভবত এরাই ছিল ভারতবর্ষের গুহাচিত্রের স্রষ্টা। ভূপালের কাছে ভীমবেটকা পাথুরে আশ্রয়ে সেই প্রথমযুগের আঁকা ছবি 6,000 খ্রীঃ পূর্বাব্দের আগের সময়কালের হতে পারে। (বেশিরভাগ কার্বন - 14 তারিখ যদিও অনেক বেশি পরের) ঃ ছবিগুলোতে দেখতে পাই শিকারীরা তীর ধনুক নিয়ে পশু শিকার করছে (2.11 নং ছবি)। ছবিতে মানুষের চেহারা কাঠির মতো। একটা চোখে পড়ার মতো ছবি হল বোঝা-মাথায় একজন নারী (2.12 ছবি)। সমাজের ভেতরে পদ কিংবা শ্রেণী ভিত্তিক বিভাজন ঠিক কতোটা ছিল, সে বুঝতে পারা যাবে এমন বিশেষ কোনো মানুষের ছবি এসব গুহাচিত্রে চোখে পড়ে না। কিংবা কৃষিকাজ, এমনকি পশুপালন সংক্রান্ত কাজকর্মেরও কোনো সংকেত এখানে নেই। রেখার টানে আঁকা একটি ময়ূরী কিন্তু সত্যিকারের শৈল্পিক দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করছে (চিত্র 2.13)।

2.2 নং সারণি ঃ প্রাচীন মানুষের কালপঞ্জী

বছর আগে	
32 লক্ষ	লুসি, অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেনসিস
26-17 লক্ষ	হোমো হাবিলিসের যুগ
20 লক্ষ	আফ্রিকায় হোমো ইরেকটাসের আর্বিভাব
20 লক্ষ	ওলডোয়ান হাতিয়ার, রিয়াত (পাকিস্তান)
10 লক্ষ	স্তরকাটা নুড়ি পাথরের সংস্কৃতি, সোয়ান অববাহিকা (পাকিস্তান)
7,00,000 থেকে 4,00,000	আকিউলিয়ান সংস্কৃতি, পাব্বি পাহাড় (পাকিস্তান) আর হিমাচল
5,00,000 থেকে 1,30,000	নর্মদা করোটি, হাথনোরা (হোমো ইরেকটাসের উদ্ভব অথবা আর্কিয় হোমো স্যাপিয়েন্স)
4,00,000 থেকে 3,00,000	দক্ষিণ ভারত (মাদ্রাজ শিল্প), রাজস্থান আর মধ্য ভারতের প্রাচীন প্রস্তর যুগের নিম্ন-সংস্কৃতি
1,50,000 থেকে 50,000	রাজস্থান, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন প্রস্তর যুগের মধ্য সংস্কৃতি
1,15,000	হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স (আধুনিক মানুষ)-এর প্রাচীনতম জীবাশ্মের বয়স, দক্ষিণ আফ্রিকা
75,000 ?	ভারতবর্ষে আধুনিক মানুষের আগমন
60,000 ?	শ্রীলঙ্কায় আধুনিক মানুষের আগমন

60,000 থেকে 20,000	পাকিস্তানের (সোয়ান অববাহিকা, রোহ্‌রি পাহাড়) প্রাচীন প্রস্তর যুগের মধ্য-সংস্কৃতি
50,000 থেকে 30,000	আফগানিস্তানে নিয়ান ডার্থাল?
34,000	শ্রীলঙ্কায় মাইক্রোলিথের আবির্ভাব
31,000	দক্ষিণ এশিয়ার (শ্রীলঙ্কা) আধুনিক মানুষের প্রাচীনতম জীবাশ্মের অবশেষ
12,500 থেকে 10,500	কর্ণাটক এবং মধ্যভারতের প্রাচীন প্রস্তর যুগের উচ্চ-সংস্কৃতি
24,000	ভারতবর্ষে মাইক্রোলিথের প্রাচীনতম সময় (পাটনে, মহারাষ্ট্র)
10,000	মধ্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি, সরাই নাহার রাই এবং মহাদহা (উত্তরপ্রদেশ)
8,000	মধ্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি, নর্মদা উপত্যকা

2.1 নং টীকা

প্রাক-ইতিহাসের কাল নির্ণয় পদ্ধতি ঃ

প্রাক-ইতিহাস এই শব্দটি পুরাতত্ত্বের বাচার্থে এমন এক সময়কালকে বোঝায়, লিখিতরূপে যার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে মুহূর্তে এমন সব প্রমাণ হাতে এলো অমনি আমরা ঢুকে পড়লাম 'ইতিহাস'-এর সাম্রাজ্যে।

আদি ইতিহাস-এ রয়েছে সেইসব সংস্কৃতি যাদের লেখা আমরা পড়তে পারিনি, কিংবা যারা নিজেরা অক্ষরহীন হলেও অন্যান্য সাক্ষর-সভ্যতার সঙ্গে তাদের যোগাযোগের প্রমাণ সূত্র থেকে আমরা তাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পেতে পারি অথবা তাদের কিছুটা বুঝতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা প্রাক-ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত যেসব সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং পরবর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে যাদের নিয়ে আলোচনা করবো, তাদের বিষয়ে আমাদের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার সংগ্রহ করা হয়েছে কেবলমাত্র তাদের ভৌত অবশেষ থেকে। স্বভাবতই, কোথায় কোনো লিখিত প্রমাণ থেকে আমরা এদের সময়কাল পেতে পারি না। নানান সব উপায় আছে আমাদের হাতে। বিশেষত ভৌত বিজ্ঞান থেকে পাওয়া নানান সব কৌশল; সেগুলো কোনো বিশেষ ভগ্নাবশেষ কিংবা সাংস্কৃতিক অঞ্চল আর সেই সঙ্গে তারা যে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত সেই সংস্কৃতিকে সময়ের কোনো বিশেষ স্তরে যুক্ত করতে আমাদের সাহায্য করে।

প্রথমত পুরাতাত্ত্বিক অঞ্চলে যখন খননকার্য চলে, তখন বিভিন্ন সংস্কৃতির নিদর্শন সম্বলিত স্তরগুলো একে অপরের ওপর চাপানো অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। মাটি

খুঁড়ে বের-করা স্তরগুলো কেবল চোখে দেখে যখন তাদের যথার্থ কাল নির্ণয় সম্ভব হয় না তখনো কিন্তু আমরা একটি পর্যায়ক্রম প্রতিষ্ঠিত করতে পারি; কেননা একেবারে নীচের স্তরটা সাধারণভাবে তার উপরের স্তরগুলোর চেয়ে প্রাচীনতর কোনো সংস্কৃতির সঙ্গেই যুক্ত হবে। একই অঞ্চলের বিভিন্ন হাড়ের তুলনামূলক (চূড়ান্ত নয়) বয়স যার যার নাইট্রোজেন, ফ্লুরিন এবং ইউরেনিয়াম-পদার্থ পরিমাপ করে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু হাড়ে ফ্লোরিন এবং ইউরেনিয়ামের মাত্রা বাড়ে আর কমে যায় নাইট্রোজেন, কাজেই এই বিভিন্ন হাড় যেসব ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত তাদের পর্যায়ক্রমে সাজাতে এই পরিমাপ আমাদের সাহায্য করে। একটা স্তর থেকে অপর স্তরে সমদূরত্ব কতটা তা তাদের ভেতরে-জমা তলানি দিয়ে মাপা যায়।

সত্যিকালের যে সন-তারিখের কাছে এই আপেক্ষিক কালপঞ্জীর চাবিকাঠি রয়েছে, সেটি পাবার জন্যে কত অসংখ্য পদ্ধতি বিকশিত হয়েছে। এইরকম দুটো মুখ্য কাল নির্ণয়ের ভিত্তি হল তেজস্ক্রিয়তা এবং চুম্বকত্বের পরিমাপ।

খুবই প্রাচীন কালের জন্য (1,00,000 বছর আগের সময় থেকে 50,000 লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত) তেজস্ক্রিয়-নির্ভর পটাশিয়াম-আর্গন (K-Ar) পদ্ধতি রয়েছে; কোনো একটি শিলাখণ্ডের মধ্যে জমে থাকা পটাশিয়াম (K-40) আর আর্গনের (A-40) অনুপাত পরিমাপ করে সেই শিলাখণ্ডের বয়স বলে দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, প্রত্ন-চুম্বকত্ব, সেটাও খুব প্রাচীন কালের জন্য বেশ কাজের। সমুদ্র শিলা এবং পলল গঠিত হবার কালে চৌম্বকক্ষেত্রের যে দিক ছিল পরেও সেটি সে বজায় রাখে। সারা পৃথিবী জুড়ে কোন সময়কালে এই চৌম্বকক্ষেত্রে দিক-বদল ঘটেছিল সেটা নির্দিষ্টভাবে জানা থাকায় (K-Ar পদ্ধতিতে চৌম্বকশিলা থেকে প্রতিষ্ঠিত), আগ্নেয় বা পাললিক শিলার চৌম্বকদশা থেকে তাদের বয়স নির্ণয় করা যায়; শিলার মধ্যে যে জীবাশ্মগুলো রয়েছে তাদের ঐ একই বয়সী হবার কথা। গত 50 লক্ষ বছরে চৌম্বকক্ষেত্রের এই রকম প্রধান চারটি দিকবদল ঘটেছিল।

এই দুটি পদ্ধতির সঙ্গে এখন আরো বেশ কয়েকটা পদ্ধতি এসে দলভারি করেছে।

ফিসন-চিহ্নেও শিলায় বয়স বার করা হয়ে থাকে। তেজক্রিয় আইসোটোপ থেকে নির্গত কণাগুলি যে অগণন ফিসন-পথ বা সূক্ষ্ম পদচিহ্ন রেখে যায় তার সাহায্যে শিলায় প্রোথিত নির্দিষ্ট খনিজ পদার্থগুলোর বয়স নির্ণয় করতে এটা ব্যবহার করা হয়।

তেজস্ক্রিয়-ক্ষয় (Redioactive decay) পরিমাপের নানারকম পদ্ধতি আছে যেমন ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম (U-Th) পদ্ধতি যার থেকে 3,50,000 বছর কিংবা আরও আগের সময়কাল নির্ণয় করা যায়। ভারতবর্ষের কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময়কাল নির্ণয় করতে U-Th পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

এইসব পদ্ধতিতে অনেক অনেক আগের কাল নির্ণয় করে যখন সেই সময়ের কথা বলা হয় তখন, সংক্ষেপে 'mya' অথবা 'my' (million year ago) বলতে নিযুত

বছর আগে আর 'kya' (thousand year ago) বলতে হাজার বছর আগে এই শব্দদুটো ব্যবহার করা হয়।

একটু কম পুরোনো সময়কাল নির্ণয় করতে যেখানে নানান খুঁটি নাটি ব্যাপারে আরো একটু নির্ভুল হওয়া বিশেষ দরকার হয়ে পড়ে, সেখানে সমস্ত জৈব বস্তুর মধ্যে রেডিওকার্বন নির্ণয় করার পদ্ধতিটা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত জৈব পদার্থের প্রাণশক্তি যখন নির্বাপিত হয়ে আসে, তখন জীবিত বস্তুতে কার্বন-12-এর সঙ্গে কার্বন-14-এর যে ধ্রুব অনুপাত, সেটি একটা স্থির মাত্রায় কমতে থাকে। এই মাত্রা জানা থাকলে (কার্বন-14-এর অর্ধ জীবন কাল হলো 5730 বছর) কোনো মৃত বস্তুতে কার্বন-12 এবং কার্বন-14-এর যে অনুপাত থাকে তার থেকেই বস্তুটি ঠিক যে মুহূর্ত্তে আর জীবিত ছিল না, সেই মুহূর্ত্ত আর আজকের সময়ের মাঝে যে দীর্ঘ ব্যবধান সেটি পাওয়া যায়। 1949 সালে এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার কিছুদিন পরে, দেখা গেল মহাজাগতিক বিকিরণে তারতম্য ঘটার জন্য, খ্রী. পূ. 800 সময়কালের আগের ক্ষেত্রে কার্বন-14-এর এই ক্ষয় পাওয়ার ঘটনা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তরু-নির্ভর-কালপঞ্জী (Dendrochronology) অর্থাৎ বার্ষিক বৃক্ষবলয়ের (tree-ring) কোনটির বর্ষণমুখর বছরে বেশি আর শুকনো বছরে কম থাকার প্রবণতা আছে, তার ভিত্তিতে জলবায়ুর তারতম্যের কালপঞ্জী প্রতিষ্ঠা করা— এই পদ্ধতির সঙ্গে কার্বন-14-এর কালনির্ণয়কে মিলিয়েই বিশেষভাবে ওপরের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে। পুরোনো আর মৃত গাছগুলোর বৃক্ষ বলয়কে বিচার করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়ায় 7,000 বছর ধরে আর্দ্র ও শুকনো বছরের একটা ধারাবাহিক কালপঞ্জী তৈরি করা গেছে। মৃত গাছের ক্ষেত্রে কার্বন কালনির্ণয় পদ্ধতিতে যে তথ্য পাওয়া গেছে তার সঙ্গে এটা মেলে না।

খ্রীষ্টপূর্ব 800 সালের পর কার্বন-14 ক্ষয়ের বিভিন্ন মাত্রা ধরে নিয়ে কার্বন-14-এর তারিখের সঙ্গে আরো কিছু সময় যোগ করে অর্থাৎ 'ক্রমাঙ্কন' (Calibration)-এর মাধ্যমে এই অমিল দূর করা যায়। লিখিত দলিলপত্র থেকে প্রাচীন ইজিপ্ট আর ইরাকের জন্য যে ক্রমপঞ্জী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তার সঙ্গে এই বাড়িয়ে দেওয়া ক্রমাঙ্কিত সময়গুলি আরো ভালোভাবে খাপ খেয়ে যায়। আমরা যতই পেছনদিকে চলি, ততই সত্যির সঙ্গে নির্ণীত তথ্যের ফারাক যেহেতু খুব বেড়ে যায়, সেজন্য 800 খ্রীঃ পূর্বাব্দের পরের কোনো সময়ের জন্য আদি অর্থাৎ অ-ক্রমাঙ্কিত কার্বন-14 সময়গুলো ব্যবহার করা উচিত নয়। এইভাবে আদি কার্বন কালনির্ণয়ে পাওয়া 3,000 খ্রী. পূ. বাড়ানোর পর হল 3,700 খ্রী. পূ.। কার্বন-কাল নির্ণয় পদ্ধতি অনুযায়ী এখন যেটা 8,000 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, সেই সময়কাল পর্যন্ত বৃক্ষ-বলয় নির্ভর ক্রমাঙ্কন পদ্ধতি বর্তমানে সহজলভ্য, তবে এই ক্রমাঙ্কিত সময়কালটি হলো 9,350 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। সেইমতো প্রবাল-সঞ্চয়-নির্ভর ক্রমাঙ্কন 18,000 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কার্বন-কালের ক্ষেত্রে কার্যকরী, অবশ্য ক্রমাঙ্কিত সময়টি হল 21,650 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এর আগেকার কার্বন-নির্ণীত সময় যেমন

আছে তেমনি রাখা হয়েছে, কেননা সত্যকার তুল্যাঙ্কে তাদের সময় বদলে ফেলার এখন আর তার কোনো মানে নেই। কার্বন কাল নির্ণয়ের সাহায্যে 40,000 খ্রী পূর্বাব্দের আগে কোনো সময় পাওয়া গেলেও সেটা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরা হয় না। অ্যাক্সিলারেটেড মাস স্পেকট্রোমিটার (Accelerated moiss spectromiter) এর ব্যবহার করে আধুনিক উচ্চমানের যে AMS কৌশল রয়েছে, তাতে কিন্তু 1,00,000 বছরেরও পুরোনো জৈব বস্তুর বয়স বলে দেওয়া যায়।

স্বীকৃত বিচ্যুতি সহ কার্বন কাল নির্ণয়ের সম্ভাব্য সময়কালের যে শ্রেণী বিধৃত হয়েছে, মাঝেমাঝেই তারসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত স্তরপর্যায় (তলার স্তরের তুলনায় উপরের স্তর বেশি কী নবীন) কিংবা অন্য কথায় আরো অনেক অনেক ক্ষেত্রে সংঘাত বাধে। আরো যেসব বিষয় এর মধ্যে ধরতে হয় যেমন, যে স্তর থেকে নমুনা নেওয়া হল সেটির ক্ষেত্রে পুরাতাত্ত্বিকের ভুল কিংবা পরবর্তীকালের কোনো জৈববস্তু লেগে থাকার জন্য নমুনা দূষিত হওয়া কিংবা পরীক্ষাগারে একটা সহজ ভুল, এরকম আরো অনেক কিছুই-এর মধ্যে থাকতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সম্ভাবনার ভিত্তিতে সময়-নির্বাচন খুবই জরুরী।

চালু রীতিতে কার্বন-14 নির্ণীত সময়কে বর্তমানের আগের (Before Present) বা 'BP' এইভাবে লেখা হয়, এক্ষেত্রে বর্তমান সময় বলতে 1950 সালকে ধরা হয়। তাই 'BC'-তে বদলে ফেলার জন্যে প্রতিটি 'BP' সময় থেকে 1950 বাদ দিতে হয়। আর 1950 'BP' থেকেও যদি তারা কম হয় তবে তাদের থেকে 1950 বাদ দিলে 'AD'-র হিসেব পাওয়া যায়। এইভাবে 3,000 'BP' হবে 1050 'BC'-র সমান আর 500 'BP' হবে 1450 'AD'। আগে কার্বন-14 দিয়ে সময় নির্ণয় করতে গিয়েই প্রথম 'BP'-কে আনা হলেও এখন অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর ক্ষেত্রেও একে ব্যবহার করা হয়।

যে বস্তুর কালনির্ণয় করা হবে সেটি তাপের সংবেদী হলে বেশ উপযোগী একটা পদ্ধতি আছে, যার নাম থার্মোলুমিনিসেন্স (Tharmoluminisince বা TL) এখনো পর্যন্ত এটি মূলত কুমোরের তৈরি সামগ্রীর কাল নির্ণয় করেছে। কাদামাটির মধ্যে যে কোয়ার্জ থাকে, গরম করলে তার থেকে শক্তি নির্গত হয়, ঠাণ্ডা করলে কোয়ার্জ আবার সেই শক্তি সংগ্রহ করে। ওর এই পুনর্সংগ্রহ করা শক্তির যখন পরিমাপ করা হয় তখন তার থেকে সেই কাদামাটি পোড়ানোর পরে কতটা সময় কেটে গেছে সেই সময়টা আমরা পেতে পারি। আগুন সইতে পারে এমন মাটি আর চকমকি পাথরের ক্ষেত্রেও এখন এই পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছে, ফলে প্রাচীনতর সময়ের (মৃৎশিল্প পূর্ব) অবশেষ আর হস্তশিল্পসামগ্রীরও সময় নির্ণয় করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

এই সংক্রান্ত আরেকটি পদ্ধতি হল অপটিক্যালি স্টিমুলেটেড ল্যুমিনিসেন্স (Optically stimulates luniniscence-OSL) বা কোনো খনিজ পদার্থ মাটি চাপা পড়লে, তারমধ্যে আটকা-পড়া আলোক-সংবেদী ইলেকট্রনের পরিমাণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে

যায়, এই তথ্যই পদ্ধতিটির ভিত্তি। পরীক্ষাগারে এটি যখন আলোকের সংস্পর্শে আসে তখনি ইলেকট্রনগুলো মুক্ত হবার সময় যে আলোক-বিকীর্ণ করে সেটা মাপা যায়, আর তা থেকেই কত সময় ধরে সেটি মাটির নীচে পোঁতা ছিলো সেটি হিসেব করা যায়।

শেষ আর একটি পদ্ধতি আছে, ইলেকট্রন স্পিন রেজোন্যান্স— যেটি খুবই সম্প্রতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

2.2 ব্যবহৃত পুস্তকসমূহের টীকা

প্রাকইতিহাসের বিষয়ে দুটো গুরুত্বপূর্ণ সংকলিত সাক্ষ্য, সমস্ত পৃথিবীর নিরিখে যেখানে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে, সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে 1994-এ। এস. জে. দ্য লায়েট (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ হিউম্যানিটি, প্রথম অধ্যায় প্রিহিস্ট্রি এণ্ড দি বিগিনিংস অফ সিভিলাইজেশান, ইউনেসকো, প্যারিস/লণ্ডন, গ্রন্থে মূলত পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণাদি রয়েছে, এবং এল এল ক্যাভালি-ফোর্জা, পি. মেনোজ্জি এবং এ পিজ্জা তাঁদের হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি অফ হিউম্যান জিনস-এ জিনগত সাক্ষ্য রয়েছে। সারা পৃথিবীতে বৃহত্তরক্ষেত্রে কি ঘটে চলেছে সে বিষয়ে একটা যৌক্তিক ধারণা তৈরি করার জন্য অবশ্য দুটি গ্রন্থই প্রয়োজনীয়। সারা পৃথিবী জুড়ে যেহেতু পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের নতুন, নতুন ঘটনা, তারিখ নির্ণয়ে নতুন নতুন কৌশলের প্রয়োগ, নতুন অন্তর্দৃষ্টি আর নতুন নতুন প্রস্তাবনা— এসব মিলিয়ে বইটিকে একটু সংশোধন পরিমার্জনের প্রয়োজন। পিটার বোগুকির দি ওরিজিনস অফ হিউ্যান সোস্যাইটি, অক্সফোর্ড, 1999-এটিও একটি প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক— এতে সমস্ত অত্যাধুনিক তথ্যাদি এবং প্রধান প্রধান বিতর্ক আছে। অ্যান্টিকুইটি, লন্ডন আর আর্কিওলজি, নিউ ইয়র্ক— এদের মতো সাম্প্রতিক জার্নালের উল্লেখ অনেক নতুন তথ্য আর ব্যাখ্যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। ইয়ান তারারসালের ওয়ান্স উই ওয়্যার নট অ্যালোন, সায়েন্টিফিক আমেরিকা, জানুয়ারি 2002, পৃষ্ঠা 38-44, গ্রন্থে অন্যান্য অবলুপ্ত মনুষ্যপ্রায় প্রজাতিগুলোর সঙ্গে আমাদের প্রজাতির সম্পর্ক নিয়ে বেশ চিত্তাকর্ষক আলোচনা রয়েছে।

ভারতবর্ষের জন্য (প্রাক 1947 সীমানারেখায়) ব্রিগেট আর রেমণ্ড অ্যালচিনের দি রাইজ অফ সিভিলাইজেশান ইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান, ভারতীয় সংস্করণ, নতুন দিল্লী, 1983 গ্রন্থটি একটু পুরোনো হলেও এখনো বেশ কাজের। আরেকটি প্রয়োজনীয় কিন্তু পুরোনো হলো ডি পি আগরওয়ালের দি আর্কিওলজি অফ ইন্ডিয়া, লন্ডন, 1982 বইটি। বি. এবং আর অ্যালচিন পরে আর একটা ছোট্টো সার্ভেতে তাঁদের আগের কাজটি একটু আধুনিক করেছেন— বইটি হল, ওরিজিনস অফ এ সিভিলাইজেশান দি প্রিহিস্ট্রি এণ্ড আর্লি আকিওলজি অফ সাউথ, নতুন দিল্লী, 1997। উত্তর ভারত, পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের জন্য এ এইচ ডানি-র (সম্পাদিত), হিস্ট্রি অফ সিভিলাইজেশান অফ সেন্ট্রাল এশিয়া, প্রথম খণ্ড, ইউনেস্কো, প্যারিস, 1992, এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলিতে মধ্য

এশিয়ার একটি যথাযথ চিত্র যুক্ত করা হয়েছে; এর পাশাপাশি ভি. সি. শ্রীবাস্তবের দি প্রিহিস্টোরিক আফগানিস্তান এ সোর্স বুক, এলাহাবাদ, 1982 গ্রন্থটিও দেখা যেতে পারে। দিলীপ কে. চৌধুরীর ইন্ডিয়া অ্যান আর্কিওলজিক্যাল হিস্ট্রি, নতুন দিল্লী, 1999 বইটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে অনেক সাম্প্রতিক তথ্য এবং প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

এই উপমহাদেশের জন্য সাউথ ইন্ডিয়া আর্কিওলজির খণ্ডগুলি দুবছর অন্তর প্রকাশিত হয় (দক্ষিণ এশিয়া পুরাতত্ত্ব বিষয়ক ইউরোপিয় অ্যাসোসিয়েশনের সভার কার্যবিবরণী), এর মধ্যে প্রাক-ইতিহাসের অনেক সমৃদ্ধ উপাদান পাওয়া যায়। দুটি প্রধান প্রাসঙ্গিক ভারতীয় জার্নাল হল ম্যান এন্ড এনভিরনমেন্ট আর পুরাতত্ত্ব; শেষেরটি অবশ্য একটু ভালোমন্দে মেশানো।

পতওয়ার/পাব্বি পাহাড়ের সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণার একটা ভালো সারসংক্ষেপ পাওয়া যাবে আর ডব্লিউ ডেনেল-এর দি আর্লি স্টোন এজ অফ পাকিস্তান এ মেথোডোলজিক্যাল রিভিউ-এ; ম্যান এন্ড অনভিরনমেন্ট, 20 নং খণ্ড নম্বর। পুনে, 1995, পৃষ্ঠা 21-28—এই গ্রন্থে। এস এম আসফাক আর সালেম উলহক-এর নিবন্ধ; এছাড়া বি আলচিন আর অর ডব্লিউ ডেনেলের পাকিস্তান আর্কিওলজি, 23 নম্বর 1987-88, পৃষ্ঠা 1-42 এবং 24 নম্বর, 1989, পৃষ্ঠা 1-20 দ্রষ্টব্য। এরসঙ্গে দেখতে হবে 'জার্নাল অফ সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া'-র 20 নং খণ্ড, 2 নম্বর, ইসলামাবাদ, 1997 জার্নালে এম. সেলিমের 'দি প্যালিওজোয়িক কালচারস অফ পতওয়ার' নামক রচনাটি।

সোরাপুর দোয়াবের ছুরি-হাতিয়ার শিল্প বিষয়ে, এস. বি দেও আর এম কে দাভালিকর সম্পাদিত স্টাডিজ ইন ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি, বোম্বে, 1985, 165-90 পৃষ্ঠায় কে পাদ্দাইয়ার রচনাটি দেখতে হবে।

সারাই নাহার রাই আর মহাদহার জন্য, জি. আর. শরমা, ভি. ডি. মিশ্র এবং অন্যান্যদের ফ্রম হান্টিং অ্যান্ড ফুড গ্যাদারিং টু ডোমেস্টিকেশন অফ প্ল্যান্টস এন্ড অ্যানিমেলস... (এক্সকাভেশান এট চোপনি মান্ডো, মহাদহা এন্ড মহাগড়), এলাহাবাদ, 1980 দ্রষ্টব্য। মহাদহার মানব-কঙ্কালগুলো 86-98 নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

নানান পাথুরে কারিগরির জন্য, এ কে বাগ (সম্পাদিত)-এর হিস্ট্রি অফ টেকনোলজি ইন ইন্ডিয়া, প্রথম খণ্ড, নতুন দিল্লী, 1997, 1-27 নম্বর পাতায় বিদুলা জয়সোয়ালের লেখা একটি অত্যন্ত উপযোগী ব্যাখ্যামূলক অধ্যায় আছে।

যশোধরা মন্ত্রপাল তাঁর প্রি-হিস্টোরিক বুক পেন্টিংস অফ ভীমবেটকা, সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লী, 1984 গ্রন্থে বিশদ কারিগরি তথ্যসহ ভীমবেটকার চিত্রগুলোর নিখুঁত পুনরুৎপাদন করেছেন।

গ্রিগোরি এল পসেহল-এর রেডিও-কার্বন ডেটস ফর সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজি, পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পেনসিলভেনিয়া, 1989 আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বই।

3.
নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব ঃ কৃষি এবং পশুর গৃহপালনের আবির্ভাব

3.1 'নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব' শব্দটির অর্থ

পাথর দিয়ে পাথরে আঘাত করে তৈরি হতো মানুষের প্রথমদিকের পাথুরে হাতিয়ার; ফলে তার তলগুলো হতো অসম, অমসৃণ। এই পর্বের একেবারে শেষ দিকে তার জায়গায় এল পাথর দিয়ে, পাথর ঘষে কিংবা একটা কঠিন পাথরের চাঁই-এর ওপর তুলনায় নরম পাথর হাতে ঘুরিয়ে তুলনায় গরম পাথর দিয়ে তৈরি করা মসৃণ হাতিয়ার (ground tool)। কাজেই সেইসব হাতিয়ারগুলোর তল মসৃণ করা গেল, বেশ গোলাকার আর সুসম আকার দেওয়া গেল তাদের (3.1 নং চিত্র)। অনেক বেশি সূচালোও হল তারা। মসৃণ লম্বা ধারওলা কুঠার কিংবা খননকারী লাঠির আগা কিংবা তীরের ফলা যেমনভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন, আগেকার প্রাচীন প্রস্তর যুগ বা মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের চেয়ে সাধারণভাবে সেগুলো আরো অনেক বেশি কাজের হয়ে উঠল। বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক ভি গর্ডন চাইল্ড (1892-1957) মন্তব্য করেছিলেন যে, এইসব নিওলিথিক (Neo-নতুন, lithic-পাথর) বা নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বস্তুনির্ভর জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটে গেল। বীজের তুঁষ ছাড়াবার জন্য দরকারী পাথরে ঘষে কিংবা পাথর দিয়ে ঘা মেরে তৈরি হওয়া মসৃণ হাতিয়ার আপনা-আপনি একটু একটু করে উন্নত হয়ে উঠতে পারল। 2.4 নং অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, সরাই নাহার রাই আর মহাদহায় 8,000 খ্রী. পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে যেসব জাঁতা (পেষাই পাথর) আর হামানদিস্তা (muller) পাওয়া গিয়েছে সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে বুনো শস্য দানা পেষাই করার কাজে ব্যবহার করা হত। জাঁতা এবং হামানদিস্তা দুটোর ক্ষেত্রেই যেহেতু পাথরের যে তল দিয়ে ঘষা হত সেই তল আস্তে আস্তে মসৃণ হয়ে যেত, তা থেকেই সম্ভবত সে কালের কারিগরদের মাথায় পাথরের হাতিয়ারের গোটা তলটাই মসৃণ করার ধারণা তৈরি হয়েছিল।

চাইল্ড-এর যুক্তি হল, একবার যেই নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার তৈরি করা শুরু হয়ে গেল, অমনি তার পরে জমি কর্ষণ করা অনেক সহজ হল। মানুষ (বিশেষত নারীরা, কেননা শ্রমবিভাজনের ফলে তখন তারা শস্যদানা আর ফলমূল সংগ্রহ করতো আর প্রধানত পুরুষেরাই শিকার করতো) যখন আবিষ্কার করল যে কেবলমাত্র বুনো শস্যদানা সংগ্রহ করার মধ্যে আটকে থাকলে চলবে না, বরং তাদের খাদ্যভাণ্ডার বাড়াতে গেলে ঐ শস্যবীজ মাটিতে রোপন করতে হবে, তখনি এরকম একটা চেষ্টা আসতে পারে। আগেকার অমসৃণ পাথরের হাতিয়ারের চেয়ে মসৃণ পাথরের কুঠার অনেক বেশি ভালোভাবে জমি পরিষ্কার করার জন্য গাছ কাটতে সাহায্য করলো। খননকারী লাঠির (যে আদিম কোদাল) সামনের সূচালো ডগা দিয়ে বীজ রোপনের জন্য মাটি আরো

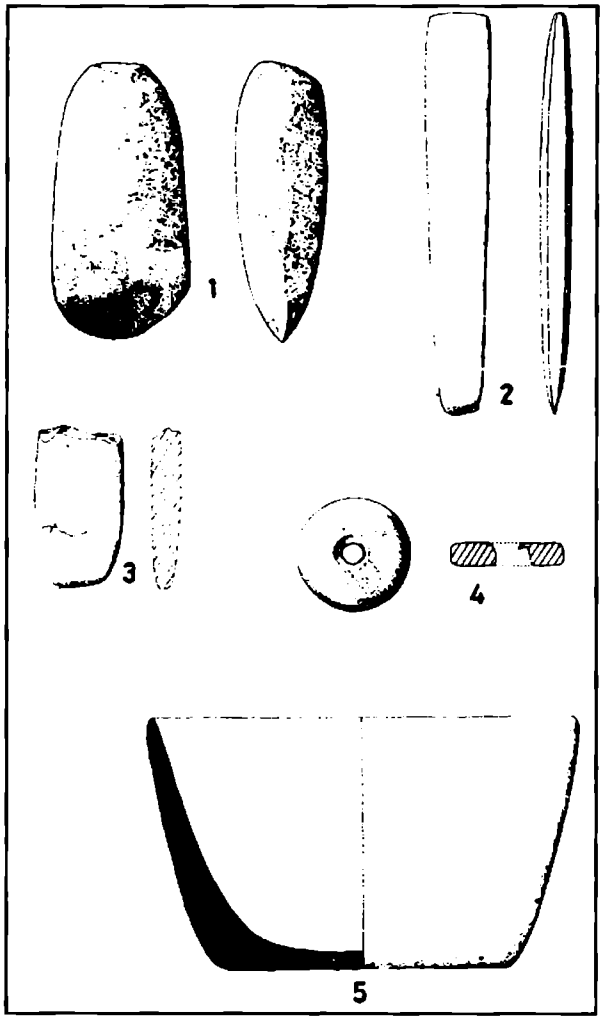

চিত্র 3.1 নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার মসৃণ পাথরের শিল্পকৃতি, মেহরগড় পর্যায় I (1) কুঠার (2) ছুরি (3) চওড়া ছুরি (4) বলয় (5) খল (জে. এফ. জারিজ অনুসরণে)

বেশি নরম করতে পারা গেল। মসৃণ এবং সূচালো বর্শার ফলা আর তীরের ডগার জন্য শিকার করাও সহজতর হল আর সেজন্য, শিকারীরা শিকার খুঁজতে খুঁজতে আগে যতদূর চলে যেত, অতটা দূরে যাওয়া এখন অনেকটা কমে গেল।

অন্যান্য উন্নতিও ঘটল কিন্তু সেটা ঠিক নব্যপ্রস্তর যুগের প্রত্যক্ষ অবদান নয়, বরং এ হল নিশ্চিতরূপে কৃষিকাজের ফল। কৃষিকাজ যতো বেশি ছড়িয়ে পড়ল, ততোই গবাদি পশুর গৃহপালন একটা দৃঢ়তর ভিত্তি পেল। শস্য কাটা হয়ে যাবার পর সেই পড়ে থাকা জমিতে গরু-মোষের জাব পাওয়া গেল। আর গবাদি পশু থেকে দুধ আর মাংস দুটোই পাওয়া গেল বলে শিকারের ওপর নির্ভরতাও কমে গেল। তখন গ্রামে বসবাসকারী কৃষিজীবী গোষ্ঠী দেখা দিল। সময়কালে সেই গোষ্ঠী কিছু বাড়তি অর্থাৎ নিজেদের নিছক বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার তার অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হল। কাদামাটি আর মাটির ইঁটে তৈরি বাড়িতে এই অতিরিক্ত শস্যদানা মজুত করা গেল। যারা উৎপাদন করতো না তারাও তখন এই বাড়তির ভাগ পেল, গায়ের জোরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করল। পরে ধর্মীয় পদ্ধতি আর চালু রীতিনীতিতে এই অধিকার নিশ্চিত করা হল। উদ্বৃত্তের এমন বেদখলের ভিত্তিতেই আবির্ভূত হল শ্রেণী, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্র।

গর্ডন চাইল্ড যাকে 'নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব' বলেছেন, তার মধ্যেই এসব ঘটেছিল। তাঁর সময়কালের পরে যেহেতু আরো অনেক নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, তাই আমাদের এই উপমহাদেশ কেমন করে এই প্রক্রিয়ার একজন অংশীদার হয়ে উঠল সেটা এখন আমরা অনেক ভালোভাবে দেখতে পাই। সিন্ধু অববাহিকার পশ্চিম তটভূমিতে অবস্থিত মেহরগড়ে (বালুচিস্তান) খ্রীষ্টপূর্ব (ক্র.) 7,000 থেকে (ক্র.) 3,800 পর্যন্ত এই বিপ্লবের প্রধান প্রধান চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। 'নব্যপ্রস্তরযুগ-বিপ্লব' সংক্রান্ত চাইল্ড-এর তত্ত্বের সমালোচকেরা মূলত এই দীর্ঘ সময়কাল— মেহরগড়ের ক্ষেত্রে প্রায় 3,000 বছর — এটির ওপর বিশেষ জোর দেন। বিপ্লব বলতে যেহেতু অনেক অল্প সময়ে বিশাল কোনো পরিবর্তন বোঝায়, তাই এক্ষেত্রে শব্দটির উপযোগিতা তারা অস্বীকার করেন। কিন্তু আগে বিকাশের যে গতি ছিল তার সঙ্গে এই পরিবর্তনের গতিকে বিচার করতে হবে। আগেকার মধ্যপ্রস্তর যুগ, মাইক্রোলিথ বা ছোটো ছোটো পাথরের হাতিয়ার ছিল যার বৈশিষ্ট্য, সেটি ভারতবর্ষের বেশিরভাগ অঞ্চলে 25,000 বছর ধরে টিকে ছিল; মানুষ তখনো মূলত আগের যুগেরই শিকারী। (ক্র.) 7,000 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তরেখায় দেখা দিল নব্যপ্রস্তর যুগের করণকৌশল, সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রস্তর যুগের আটভাগের একভাগ সময়ে এতসব পরিবর্তন ঘটে গেল। নব্যপ্রস্তর যুগের এই আপাত হ্রস্বতা, তার সঙ্গে সঙ্গে এই যুগ মানুষের সামাজিক জীবনে যেরকম প্রভূত পরিবর্তন এনে দিল, তাতেই এই যুগের মাথায় 'বিপ্লব'-এর শিরোপা।

3.2 পশ্চিম সীমান্তরেখায় প্রথম কৃষিজীবী গোষ্ঠী, (ক্র.) 7,000-4,000 খ্রী পূ

খ্রীষ্টপূর্ব 10,000 থেকে 9,000 (ক্র.) এই সময়কালের মধ্যে নব্যপ্রস্তর যুগের করণকৌশল প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল সিরিয়া আর প্যালেস্টাইনে। ভারতবর্ষের দরজায়

এর শিকল নাড়ার শব্দ শোনা গেল প্রায় খ্রী পূ 10,000 বছর আগে; অবশ্য উত্তর-আফগানিস্তানের ঘর-ই-আস্‌প্‌ কিংবা আখ কুপরূক-দ্বিতীয় পর্যায় (Ghar-i Asp or Aq Kupruk)-এর আশপাশ থেকে পাওয়া কুমোরের হাতের ছাপ-হীন (অ-মৃৎশিল্প বা মৃৎশিল্প-পূর্ব) নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারে ভরা স্তরটির (statum) জন্য কার্বন-কাল নির্ণয়ের ওপর যদি কারো আস্থা থাকে, তবেই একথা বলা যাবে। ঘর-ই-মার বা আখ কুপরূক দ্বিতীয় পর্যায়ের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে পাওয়া সামগ্রী যে প্রায় (ক্র.) খ্রী পূ 7,500 সালের সেটা অনেক বেশি ঠিক বলে মনে হয়। এমন কি 16,000 বছর আগেও এখানে ভেড়া আর ছাগলকে ইতিমধ্যেই পোষ মানানো হয়েছিল। আফগানিস্তান থেকেই এই মধ্যপ্রস্তরযুগের করণকৌশল নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়, ফলে তখন গোটা সিন্ধু অববাহিকায় তা পৌঁছে গেল। বালুচিস্তানের বিখ্যাত বোলান গিরিপথের নিচে, কিন্তু ভৌগোলিকভাবে সিন্ধু অববাহিকার অন্তর্গত কাচ্চি সমভূমিতে

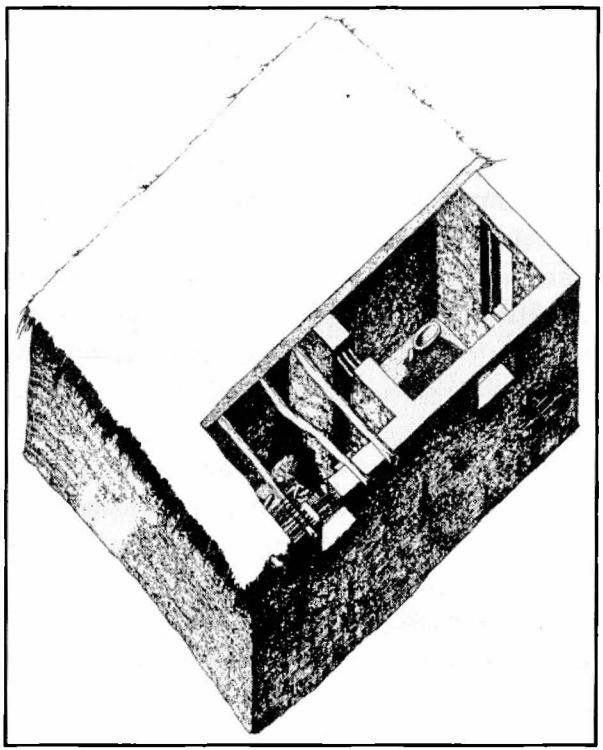

চিত্র 3.2 'E-বাড়ি'-র সমমাপ-বিশিষ্ট পুনর্গঠন, মেহরগড়, পর্যায় 1 (জি. কুইভরন অনুসরণে, জি. পসেহল থেকে)

মেহরগড়ের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এমনসব এলাকা পাই, যেগুলো বস্তুত নব্যপ্রস্তরযুগীয় বিপ্লবের প্রতিটি দশা প্রত্যক্ষ করেছে।

এমনকি মোটামুটি খ্রী পূ 7,000 থেকে 5,000 (কার্বন-14 দ্বারা নির্ণীত সময়) পর্যন্ত বিস্তৃত এর প্রাচীনতম দশা বা প্রথম কালে (মেহরগড় প্রথম পর্যায়) গ্রামের মানুষ রোদে-পোড়ানো সমান মাপের মাটির ইঁট দিয়ে তৈরি করা বাড়িতে বাস করছিল। আগুন রাখার নির্দিষ্ট জায়গা সমেত ছোটো ছোটো কামরায় বিভক্ত ছিল বাড়িগুলো (3.2 নং ছবি)। বেশ বিশাল কাঠামোগুলো সম্ভবত দীর্ঘ গুদাম-ঘর।

খুঁজে-পাওয়া শস্যদানায় কৃষির উপস্থিতি নিশ্চিত হয় ঃ এদের বেশিরভাগই খোসাহীন ছ'সারির বার্লি; খুব অল্প পরিমাণে বার্লির অন্যান্য উপ-প্রজাতিগুলোও ছিল যেমন, খোসাযুক্ত ছ'সারি আর দু'সারির বার্লি, তাছাড়া গমের মধ্যে ছিল এইনকর্ন (eincorn), এমার (eminer) এবং হার্ড (hard) এইসব প্রজাতি। সম্ভবত পশ্চিম এশিয়া থেকেই এরকম দানাশস্যের চাষ অন্যত্র বিস্তার লাভ করেছিল। কৃষির কারণেই মনে হয় পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করার ক্ষেত্রে বাড়তি উদ্যম দেখা গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই ছাগল গৃহ-পালিত হয়ে গেছে; কুঁজওলা ষাঁড় (ভারতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বা 'জেবু' ষাঁড় আর গরু) আর ভেড়া এবার বশীভূত হলো এবং ফাঁদে ফেলা বুনো পশুদের সঙ্গে তাদের প্রজনন ঘটানো হলো। বুনো জন্তু, তার মধ্যে মোষও আছে, যারা তখনো পর্যন্ত গৃহপালিত হয়নি, তারা ছিল খাদ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার; অতএব শিকারও ছিল একটা তাৎপর্যময় পেশা।

খুঁজে-পাওয়া অঞ্চলগুলোতে নব্যপ্রস্তর যুগের (চিত্র 3.1) বিচিত্র সব হাতিয়ার রয়েছে; এর মধ্যে আছে জাঁতা, হামানদিস্তা, গুঁড়ো করার পাথর, পাত্র— আরো আছে টুকরো টুকরো পাথুরে ফলক, অন্যান্য সব পাথরের এমনকি হাড়ের হাতিয়ার। এসসব স্তরভিত্তিক সামগ্রীর পুনর্বিবেচনায় বোঝা যায় যে এটি অ-মৃৎশিল্পের কাল অর্থাৎ মাটির সামগ্রীর আগের সময়। নলখাগড়ায় তৈরি ঝুড়ি, তার সঙ্গে উল কিংবা পশুলোমে তৈরি কাপড়, এসবে বয়নের চিহ্ন রয়েছে, মৃতদের তারা মাটিতে পুঁতে দিতো। পাশে রেখে দিত পুঁতির অলংকার (কাচের মতো এক ধরনের পদার্থ বা ট্যালক আর সাজিমাটির) আর শাখের বালা। তাদের হস্তশিল্প সামগ্রী আর শস্য মজুত রাখার বিপুল ব্যবস্থা দেখে বুঝতে পারা যায় যে, সমাজে শ্রেণী বিভাজনের অস্তিত্ব ছিল, সেখানে উদ্বৃত্ত উৎপন্নের উপর ধনী এবং ক্ষমতাবানদের বিপুল দাবি প্রতিষ্ঠিত এবং এই উৎপন্নের বিনিময়ে পাওয়া যেত তুলনামূলকভাবে দামি হস্তশিল্প সামগ্রী। কৃষিজ উৎপাদন কেবলমাত্র পশুকে গৃহপালিত করার কাজটিই ত্বরান্বিত করল তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের পেশা হয়ে ওঠার ভিত্তি স্থাপন করল।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে (5,000 থেকে 4,000 খ্রী পূ) মেহেরগড় নব্যপ্রস্তর যুগ দ্বিতীয় পর্যায়ে পা দিল। সম্ভবত সেখানে প্রথম পর্যায়ের মানুষজনই রয়েছে কেননা

অনেক গুরুত্বপূর্ণ বদল সত্ত্বেও ধারাবাহিকতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেইরকমই কাঁচা-ইঁটের তৈরি বাড়িই রয়েছে, তবে ইঁটগুলো নানান আকারের। যেগুলো দেখে শস্যের ভাঁড়ার বলে মনে হয় সেই কাঠামোগুলো এখন অনেক বিশাল হয়ে গেছে এবং কৃষির আরো উন্নতির সাক্ষ্য মেলে এতে। আমাদের এই উপমহাদেশে কৃষিকাজের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট প্রাচীনতম যে হাতিয়ার পাওয়া গেছে তা হলো বিটুমেন খণ্ডের সঙ্গে আটকানো কাস্তের পাত (3.3 নং ছবি)। যেসব বিভিন্ন প্রকারের গম, বার্লি পাওয়া গেছে তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হল সেচ আর এইরকম কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে প্রবাহিত স্রোতধারার স্থানে স্থানে ছোটো ছোটো বাঁধ বানিয়ে জল আটকে রেখেই সেচের কাজ করা সম্ভব ছিল। জলের ওপর এমন নিয়ন্ত্রণেই সম্ভবত মানুষ কার্পাস গাছ লালন পালন করতে সক্ষম হল; মেহরগড়, দ্বিতীয় পর্যায়ে পাওয়া বিপুল পরিমাণ পোড়া তুলোবীজই কার্পাসবস্ত্রের উৎস সম্পর্কে আমাদের জানা প্রাচীনতম নিদর্শন বহন করছে। আর তাই এটি পৃথিবীর কৃষি ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনার সাক্ষর হয়ে আছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় 4,000 সাল নাগাদ ছাগল আকারে বেশ ছোটো হয়ে গেল আর ভেড়াও আকারে ছোটো হতে শুরু করলো— এ সবই পশুকে গৃহে পালন করার নিশ্চিত চিহ্ন। কয়েক প্রকার 'জেবু' গবাদি পশু তখনো বনেজঙ্গলে পাওয়া গেলেও খুঁজে পাওয়া হাড়গুলি বিচার করলে বোঝা যায় মাংসের উৎস হিসেবে গৃহপালিত পশুরা সংখ্যায় বুনো পশুদের ছাড়িয়ে যেতে চাইছিল।

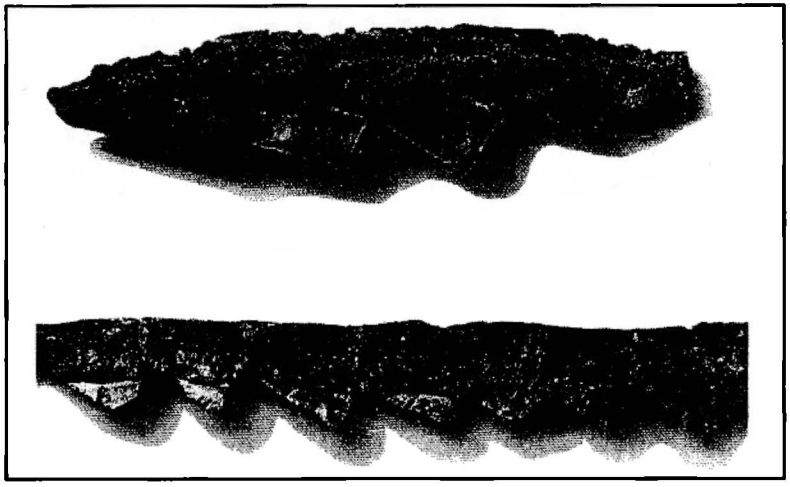

চিত্র 3.3 কৃষিকাজের হাতিয়ার (বিটুমেনে লাগানো কাস্তে-পাথর), মেহরগড়, পর্যায় 2 (মনিক লেচেভালিয়ার অনুসরণে)

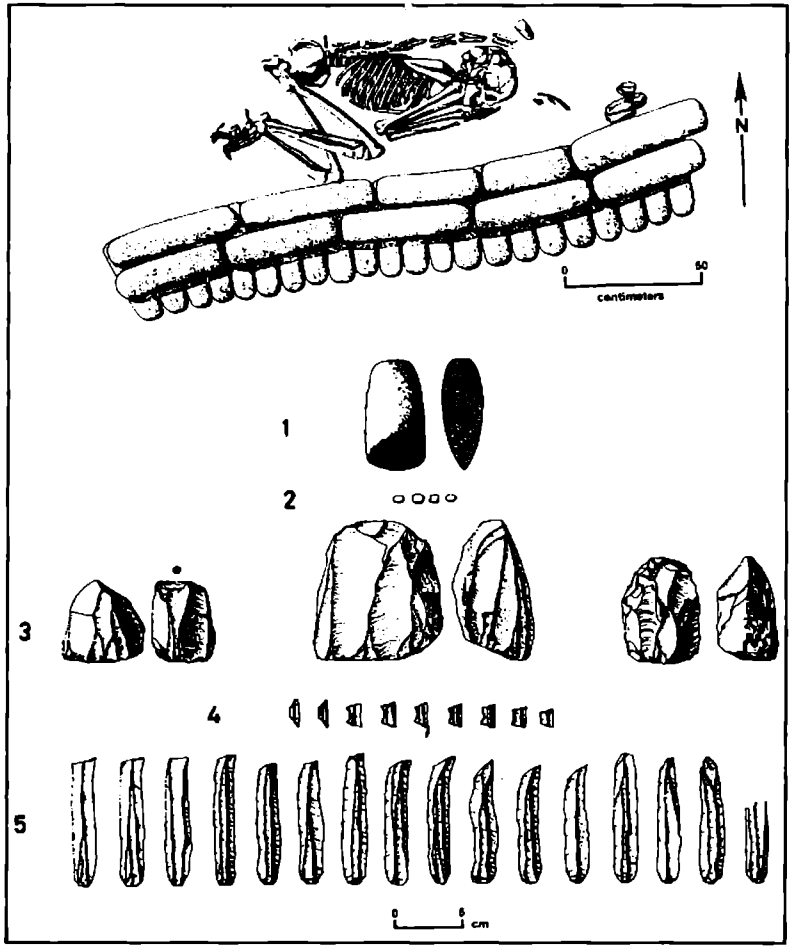

চিত্র 3.4 শিল্পীয় সমাধি, মেহরগড়, আবিষ্কৃত হাতিয়ার সমূহ
সারিতে বিন্যস্ত হাতিয়ারগুলি ওপর থেকে নীচে
(1) মসৃণ পাথরের কুঠার (2) চারটে টারকোইজ পুঁতি (3) তিনটে চকমকি পাথরের টুকরো যার থেকে হাতিয়ার তৈরি হবে (4) নটা জ্যামিতিক আকারের ক্ষুদ্র পাথরের টুকরো (5) ষোলোটা চকমকি পাথরের ছুরি (জে. এফ জারিজ এবং অন্যান্য অনুসরণে, জি পসেহল থেকে)

এই পর্যায়ের শিল্প বিকাশে বেশ উত্তেজক কিছু নতুন উপকরণও ছিল। শুরুতে এলো মৃৎশিল্প। প্রথমে বেয়াড়া আকারে কিন্তু বেশ কাজ-চালানো গোছের শুকনো

কাদামাটির পাত্র তৈরি করতে কাদামাটির একটা তাল অন্যটার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো। তারপর এলো চুপড়ি, তার গায়ে সিমেন্টের মতো বিটুমেন কিংবা অ্যাসাল্টের প্রলেপ লাগানো, কাদামাটির পাত্রের ছাঁচ হিসেবে এগুলো ব্যবহার করা হতো আর পাত্রগুলোকে শক্তপোক্ত করার জন্য চুপড়িগুলোকেও আগুনে পোড়ানো হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ের একেবারে শেষের দিকে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় 4,000 সাল নাগাদ এলো কুমোরের ঘুরন্ত চাক। এই কারিগরি যন্ত্রটি আমদানি করা হয়েছিল পশ্চিম এশিয়া থেকে, সেখানে প্রায় 5,000 খ্রী পূর্বাব্দেই এটিকে দেখতে পাওয়া যায়। এখন খুব দ্রুত সুসম আকার পাবার জন্য পাত্রগুলোকে এই অনুভূমিক চাকার ওপরে ঘোরানো যায়। কেবলমাত্র হাত দিয়ে পাত্র গড়ার সময়ে এমন আকারের কথা কল্পনাও করা যেতো না। অতএব এর উদ্ভাবনে সত্যিই মানুষের অনেকটা সময় বেঁচে গেল, মাটির সামগ্রীর দাম কমলো, সকলের কাছে তা সহজলভ্য হলো।

মেহেরগড়, প্রথম পর্যায়ের কিছু পাথর আর হাড়ের হাতিয়ার তখনো টিকে আছে কিন্তু তাদের প্রকারে বিভিন্নতা বেড়েছে। তথাকথিত 'কারুশিল্পীর সমাধি' বিশেষ চিত্তাকর্ষক। শিল্পী মানুষটির সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পোঁতা হয়েছে একটা পালিশ করা (নব্যপ্রস্তর যুগের) কুঠার তিনটি চকমকি পাথরের ভেতরের অংশ (ওর থেকে হাতিয়ার বানাবে বলে?), চকমকি পাথরের ন'টা জ্যামিতিক ছোট ছোট অর্থাৎ মাইক্রোলিথ, ষোলোটা টুকরো ফলক (Chipped blades)। মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলো তখনো কেমন করে নতুন নতুন উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হচ্ছে এ হলো তারই নিদর্শন (3.4 নং চিত্র)। ইতিমধ্যেই ঝুড়ি তৈরি করার কাজে বয়নশিল্প এসে পড়েছে; তারপর একবার যখন কার্পাস উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে তখন এটা ধরেই নেওয়া যায় যে, সুতো কেটে আর তাকে বুনে কাপড় তৈরি করা শুরু হয়ে গেছে।

সমাধিস্থানগুলিতে ধর্মীয় প্রথার বহুল নিদর্শন (প্রথম পর্যায় থেকেই রাঙা গিরিমাটির বহুল ব্যবহার) দেখতে পাওয়া যায়, বোঝা যায় লোকাতীত জীবনে তারা বিশ্বাস করত। সমাধিগুলোর ভেতরে, যেসব সামগ্রীর কথা এইমাত্র বলা হয়েছে যেমন, হাতিয়ার, হত্যাকরা পশু, এসবই কেবল থাকতো না, অলংকারও থাকত যেমন, নীলকান্তমনি, নীলার মতো দামি পাথর, কর্নেলিয়ান, তবে শঙ্খ ছিল না। এরকম তথাকথিত দামি পাথর মেহরগড়ের নিকটবর্তী কোনো অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়নি, অতএব এগুলো বাণিজ্যপথে অনেক দূরের দেশ থেকে আনা হয়েছে। কোনো কোনো সমাধিতে এমন সব মূল্যবান সামগ্রীর উপস্থিতি, আবার অন্যগুলোতে তার অনুপস্থিতি—এর মধ্যে সামাজিক পার্থক্যবৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়। বাণিজ্য আর উৎপাদন দুয়ের বৃদ্ধিতেই এমন ঘটনা ঘটে।

তখনো ছোট ছোট শিল্পকর্ম ছিল। পাওয়া গেছে পা অথবা বেহালা-সদৃশ কাদামাটির ছোট ছোট সব মূর্তি, গিরিমাটি রঙ তাদের, জাদুকরী শক্তির জন্য তাদের বিশেষ কোনো

তাৎপর্য্য থাকতে পারে, কয়েকটি পশুর কাদামাটির মূর্তিও সেখানে রয়েছে, আর একটা অদ্ভুত রকমের টেরাকোটায় তৈরি (শক্ত পোড়ামাটি) নলাকার পুঁতির মালা পাওয়া গেছে যেটা দেখলে কোনো উদ্ভিদের কথা মনে আসে।

মেহরগড় ছিল একটা গ্রাম; এরকম আশেপাশে আরো অনেক গ্রাম নিশ্চয়ই ছিল। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্য কোনো গ্রামে যেহেতু খননকাজ চালানো হয়নি, কাজেই বালুচিস্তানের উচ্চভূমিতে কোয়েভার কাছে কিলি গুল মোহাম্মদ-এ যে প্রাচীনতম প্রাক-মৃৎশিল্প পর্যায়টিতে গরু মোষ, ভেড়া আর ছাগল, এইসব পশুর গৃহপালনের প্রমাণ মিলেছে সেটিকেই এখন মেহরগড়ের প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ধরা হয়। বালুচিস্তানে এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দক্ষিণের জেলাগুলো (NWEP)-র অন্যান্য এলাকাতেও মেহরগড়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অনেক হস্তশিল্প পাওয়া গেছে; সিন্ধুর বদ্বীপেও এমন দুটো বিচ্ছিন্ন অঞ্চল রয়েছে। এই বিশাল বিস্তীর্ণ অনুর্বর পাহাড়ী অঞ্চলেই আমাদের ভারতবর্ষের প্রথম কৃষি আর পশুপালন অর্থনীতির উন্মেষ ঘটেছিল এ কথা যে কেউ অনুমান করতে পারে। বস্তুকেন্দ্রিক অগ্রগতির এই বিস্তৃত নকশার আওতায় যতখানি এলাকা ছিল, স্পষ্টতই বিশাল ভূমধ্যসাগর থেকে সিন্ধু পর্যন্ত তার বিস্তার। মেহরগড়ের বস্তুকেন্দ্রিক অগ্রগতির প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপ এই বিশাল এলাকার একটি কিংবা অন্যান্য অংশেও হয় উদ্ভূত নয়তো নকল করা হয়েছে। অনেক উপায়েই এই অঞ্চলে চিন্তাভাবনা আর কৌশল ছড়িয়ে পড়তে পারে, কিন্তু পশুপালক যাযাবর সম্প্রদায়ের মানুষজন যেহেতু একস্থানের গোষ্ঠী এবং অন্য আরেকটির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চালাতো, কাজেই চিন্তাভাবনা এবং উৎপন্ন দুয়েরই প্রধান বাহক ছিল তারাই। মানুষের দেশান্তরে যাওয়া, বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এ বিষয়টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকবে; কিন্তু পুরাতত্ত্বে এমন কোনো একটিমাত্র ধর্মীয় রীতিনীতি কিংবা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকেও নির্দ্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি, গোটা অঞ্চলের সর্বত্র যার প্রভাব ছিল। নিশ্চিতভাবে এখানে কোনো একটিমাত্র জাতি ছিলও না। মেহেরগড়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে পাওয়া অসংখ্য কঙ্কালের দাঁতগুলির গভীর অধ্যয়নে দেখা গেছে যে, ভারতবর্ষের এই 'আদি কৃষকদের' সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার মানুষজনের চেয়ে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার, জনসমষ্টির বেশি সাদৃশ্য ছিল। নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব প্রায় পুরোপুরি শেষ হবার পরেই সম্ভবত মেহরগড়ের বাসিন্দাদের জিনগত জটিলতায় একটা পরিবর্তন এসে থাকবে।

3.3 সিন্ধু অববাহিকার ব্রোঞ্জ সভ্যতার অভিমুখে (ক্র.) খ্রী পূ 4,000-3,200

মানব সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের আদর্শ ধারাটি চিরাচরিতভাবে যেমন করে দেখা হয় তারই স্রোত বেয়ে নব্যপ্রস্তর যুগের পরে এল তাম্রযুগ, ঠিক যেমন মধ্যপ্রস্তর যুগের পরবর্তীতে এসেছিল নব্যপ্রস্তর যুগ। অবশ্য একটা পার্থক্য খেয়াল করতেই হবে।

নব্যপ্রস্তর যুগ বা হাতিয়ারের আবির্ভাব আর তার সঙ্গে কৃষির উদ্ভব এই গোটা ব্যাপারটা তার পূর্বতন সময়ের থেকে এমন এক নতুন অগ্রগতি যে, নিজের থেকেই যেসব গোষ্ঠী মধ্যপ্রস্তর যুগ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগে পৌঁছেছিল তাদের পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ অত্যন্ত বিরল। কোনো প্রাক নব্যপ্রস্তরযুগীয় স্তর ছাড়াই মেহরগড়ের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছিল। অন্য কথায়, ব্রোঞ্জের (টিনের সঙ্গে তামার সংকর) এসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাটা ঘটছিল। তামার আকরিককে গলিয়ে তার থেকে ধাতু নিষ্কশন করা হলেও কোনোভাবে হাতিয়ার তৈরি করার সাধারণ উপাদান হিসেবে পাথর বা হাড়ের জায়গা নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর কারণ হল ধাতু পাওয়া যেত খুব অল্প পরিমাণে তাই তা দুষ্প্রাপ্য আর মহার্ঘ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে (খ্রী. পূ. 1,000 সালের পর) ভারতবর্ষে যখন লোহার কারিগরি জ্ঞানে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি হলো, একমাত্র তখনই মানব-হাতিয়ারের প্রধান উপাদান হিসেবে পাথরের ব্যবহার কমে এল। তামা আর ব্রোঞ্জ যেহেতু পাথরের হাতিয়ারের সঙ্গে সামান্য একটু বাড়তি সুবিধে হিসেবে দেখা ছিল আর সাধারণত পরিমাণে তা অল্পও ছিল, সে কারণে, সমাজ যখন নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে তাম্রপ্রস্তর যুগে (চারকোলিথিক) পা দিল তখন সেটাকে কোনো বিরাট বাঁক বলে মনে হলো না।

এরকম ধারাবাহিকতার একটা তৃতীয় কারণও ছিল মনে হয়। কৃষির সহায়তায় নব্যপ্রস্তর যুগের গোষ্ঠী উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে শুরু করেছিল। নবাগতরা সম্ভবত অনেক উন্নত (ব্রোঞ্জ) অস্ত্র নিয়ে আসতো যার সাহায্যে সহজেই যুদ্ধে জিততো আর বিজিত বাসিন্দাদের এখন আর নির্বিচারে হত্যা না করে কিংবা তাড়িয়ে না দিয়ে নিজেদের জমিতেই আটকে রাখতো যাতে সেই বিজিতেরা যে বাড়তি উৎপাদন করবে তার ভাগ পাওয়া যায়। অধীন জনসমষ্টি যেহেতু তাদের পুরোনো লৌকিক এবং অধ্যাত্মিক ধারাতেই জীবনযাপন করত, তাই সাংস্কৃতিক বহমানতার একটা চোখে পড়ার মতো উপাদান তখনো থেকে যেতে পারে।

মেহরগড়ের দ্বিতীয় পর্যায় যখন এলো তখন এমনি কিছু একটা ঘটে থাকবে। এই পর্যায়ের (ক্র.) খ্রী.পূ. 4,300 থেকে 3,800 সময়কালের মাটির সামগ্রী সব ৭৫ হেক্টর জায়গা জুড়ে এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। সমস্ত অঞ্চলে অবশ্যই একই সময়কালে জনবসতি থাকা সম্ভব নয়; তবু বলা যায় যে, আকারের দিক থেকে নি সন্দেহে জনবসতির বিশাল একটা প্রসারণ ঘটেছিল। একইরকম মৃৎশিল্প (টোগু পণ্য) যেখানে যেখানে দেখা গেছে, সে এলাকাগুলো অবশ্যই একই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত এবং সেখানেও জনবসতি এইভাবে আকারে বিস্তৃত হয়েছে। (টোগু সংস্কৃতির এলাকাগুলো মেহরগড়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মতোই, তবে আফগানিস্তানে কান্দাহারের কাছে মুণ্ডিগাক (Mundigak) অনেক দূরের একটি লক্ষ্যণীয় সংযুক্তি।

জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি যদি প্রধানত কৃষির উন্নতি এবং হস্তশিল্পের (আরো বিশদের

জন্য নীচে দেখতে হবে) দান হয়, তবে আরেকটা কারণ হতে পারে নতুন কোনো জনসমষ্টির অনুপ্রবেশ। মেহরগড় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের বাসিন্দাদের দক্ষিণ এশিয় বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে মেহরগড় তৃতীয় পর্যায়ে পাওয়া কিছু সমাধিস্থ কঙ্কালের সঙ্গে ইরান মালভূমির বাসিন্দাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। এতে বেশ স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, পশ্চিম থেকে বেশ ভালো সংখ্যায় অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কর্ষিত শস্যের বিশাল তালিকা থেকেই কৃষির অগ্রগতি দেখতে পাওয়া যায়, এর মধ্যে আছে চার প্রকারের গম, দু-সারির বার্লি আর ওট। কিন্তু বিকাশের চিহ্ন সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে হস্তশিল্পে। মেহরগড় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যেখানে প্রাকৃতিক তামার টুকরো এমনকি ধাতুমলও দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে তৃতীয় পর্যায়ে চোদ্দোটিরও বেশি মাটির মুচিতে পড়ে থাকা তামার অবশেষ তামা-গলানোর ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। সবুজ ট্যালাইটের (শক্ত, জমাট পাথর) নলাকার খুব ছোট্টো তুরপুন, যাকে একটা ধনুকের সুতোয় বেঁধে ঘোরানো যায়, তার থেকে এটা বোঝা যায় যে, যন্ত্র যতোই পরিশীলিত হোক না কেন, এখনো পুরোটাই পাথরের তৈরি। নীলার মতো একরকম পাথর লাপিস লাজুলি, কর্নেলিয়ান, গার্নেট, টারকোইজ, নীলকান্তমনি, শঙ্খ আর বিটুমেন নিয়ে কাজ করারও অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে; এসব ক্ষেত্রে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় গাদ (Wastes) স্থানীয় ভাবে পরীক্ষা করা হত।

পাথরকে প্রচণ্ড উত্তপ্ত করে যে স্টারটাইট (startite) মণ্ড পাওয়া যেত তাতে পুঁতি হতো। শানপাথর আর পালিশ-করা পাথরের কুঠার আমাদের নব্যপ্রস্তর যুগভিত্তিক যন্ত্রকারিগরির কথা মনে করিয়ে দেয়; কিন্তু প্রাচীন মধ্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি চিহ্ন বহনকারী মেসোলিথের থেকে মানুষ এখন অনেকখানি সরে এসেছে তাও চোখে পড়ে।

মৃৎশিল্পে একটা দারুণ অগ্রগতি ঘটেছিল। চাকার ওপর ঘুরিয়ে আর চুল্লীর আগুনে পুড়িয়ে মৃৎপাত্র যে এখন কোনো কিছু সংগ্রহ করার সবচেয়ে প্রধান উপায় তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। এতো বিশালাকার সব মৃৎপাত্র পাওয়া গেল যে, পুরাতাত্ত্বিকরা চাইলেন, এদের নাম হোক 'গণ-উৎপাদন'। ঐ একই সময়ে পাত্রের গায়ে আঁকা মানুষ কি পশুর ছবিতে আর জ্যামিতিক বিন্যাসে, আজকের 'লোক' শিল্পের একটা আভাস পাওয়া যায় (চিত্র 3.5)।

মেহরগড়ের তৃতীয় পর্যায়ে পাওয়া ভগ্নাবশেষে 'চুল্লী' আর যন্ত্রশালা সমেত হস্তশিল্পের যে বিকাশ দেখা যায়, তাতে সমাজে শ্রেণীবিভাজনের অগ্রগতিতে আর একটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। কোনো এক ধরনের সামগ্রী তৈরির কাজকে পূর্ণ সময়ের পেশা ধরে যেসব মানুষ দিন চালাতো তারা তাদের পণ্যসামগ্রী সম্ভবত বিনিময় প্রথায় (barter system) বিক্রি করে জীবনযাপন করতো। হস্তশিল্পীরা যখন তামা, কিছুটা দামি পাথর, শঙ্খ এরকম হরেক উপাদান নিয়ে কাজ করত, তখন সে সময় নিশ্চয়ই বেশ ভালো পরিমাণেই বহির্বাণিজ্য হত। নিজেদের বাণিজ্য-পণ্যকে যে তারা চিহ্নিত

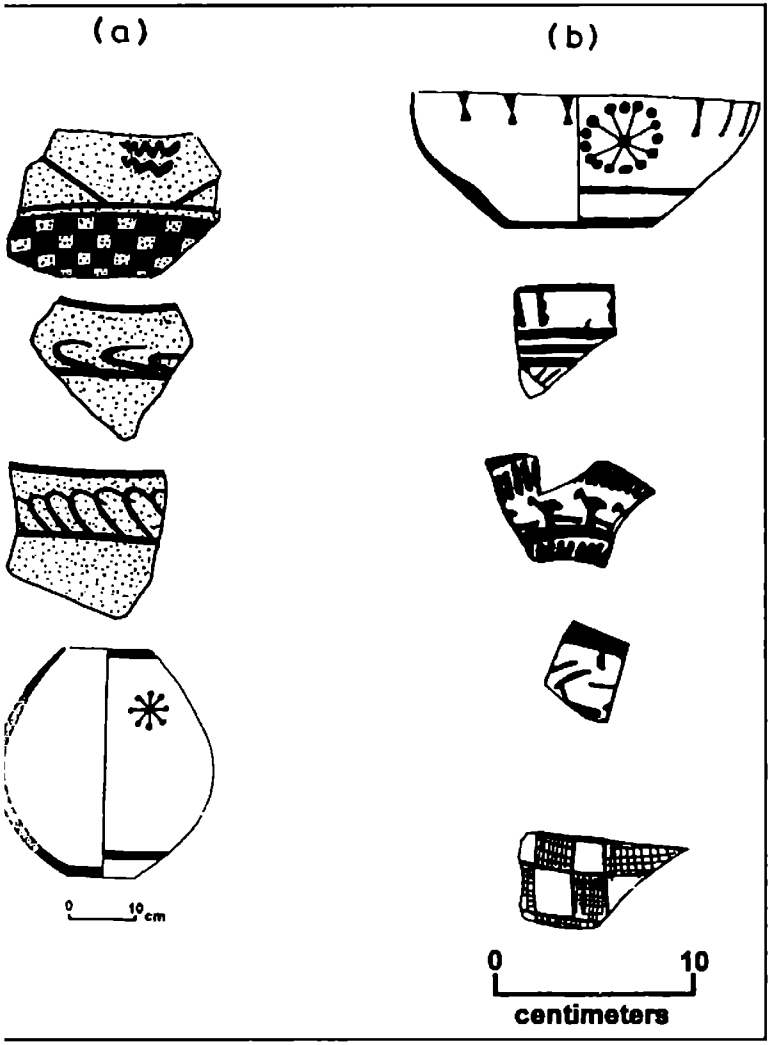

ত্র 3.5 টৌণ্ড পর্যায়ের মৃৎশিল্প। (ক) কিলি গুল মোহম্মদ থেকে, তৃতীয় পর্যায় (লালের ওপর ালো) আর (খ) মেহরগড়, তৃতীয় পর্যায় (ডব্লিউ. এ. ফেয়ারসার্ভিস এবং এ. সামজুম নুসরণে, জি. পসেহল থেকে)

রার প্রয়োজন অনুভব করেছিল তার সাক্ষ্য হলো তামার শীলমোহরের আবিষ্কার। টা বাণিজ্য বৃদ্ধির একটা নিশ্চিত চিহ্ন।

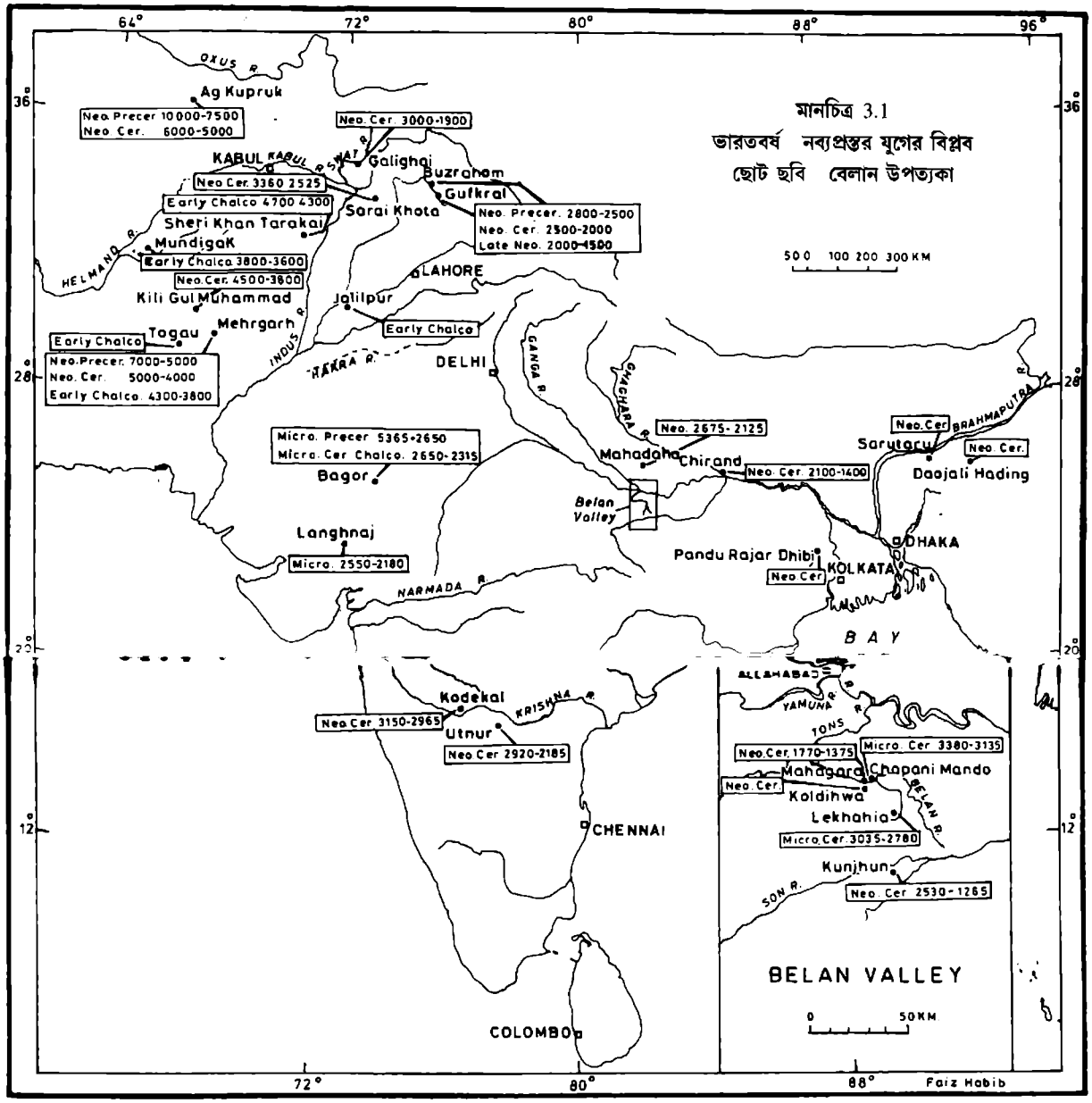

সংক্ষিপ্ত রূপ

Micro মাইক্রোলিথিক

Neo নিয়োলিথিক

Chaleo চারকোলিথিক

Precer প্রি-সেরামিক

Cer. সেরামিক

সংখ্যায় আজকের থেকে কত বছর আগে তার হিসেব

জীবনের অন্যান্য বস্তুকেন্দ্রিক অবস্থা আর বাড়ির গঠনে প্রাচীনতর নব্যপ্রস্তরযুগ থেকে বয়ে আনা অনেক ধারাবাহিকতা নজরে পড়ে। অংশত প্রথা আর ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই এই ধারাবাহিকতা বিস্তৃত হয়েছে বলে মনে হয়। আগেকার সময়ের মতো সমাধিস্থ ব্যক্তি-মানুষের গায়ে এখনো একইরকম অলংকার দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু মৃতদেহগুলি একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, যুবতী নারীরা এখন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ আর শিশুদের চেয়ে অনেক বেশি অলংকার পরেছে— পুরাকালের প্রথা থেকে এ এক সুস্পষ্ট সরে-যাওয়া। এর সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস আর আচারেও আপাতভাবে বেশ কিছু বড় বড় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। অন্য জগতে মৃতদের সঙ্গ দেবার জন্য পশু ও অন্যান্য সামগ্রী এখন আর মাটিতে পোঁতা হয় না; সমাধিতে লাল গিরিমাটির দেদার ব্যবহার আর নেই। অন্য দিকে এখন কয়েকটি সমবেত সমাধি কিংবা পুনরায় মাটিতে পোঁতার (কঙ্কালের কেবলমাত্র খণ্ড খণ্ড অংশ নিয়ে) ঘটনা ঘটছে, আগে যা কখনো দেখা যায়নি।

প্রায় খ্রী পূ 3,800 সাল নাগাদ মেহরগড়ের জনবসতি ক্ষয় পেতে শুরু করে। কিন্তু ঐ একই এলাকায় পুরাতাত্ত্বিকরা একটা নতুন ধরনের মৃৎশিল্প-সমৃদ্ধ অনেকগুলো অঞ্চলকে চিহ্নিত করেন— কিলি গুল মোহম্মদ-এর কাছে কেচি বেগ স্থানের নামানুসারে এই মৃৎশিল্পের নামকরণ করা হয়েছে। এটি টোগু মৃৎশিল্পের জায়গা দখল করে নিল আর নব্যপ্রস্তর যুগের পরের দিকের দশার চিহ্ন হিসেবে টিকে রইল (ক্র.) খ্রী পূ 3,200 অবধি। NWEP-র শেরি খান তারাকাই স্থানে হস্তশিল্প সামগ্রী, বিশেষ করে পোড়ামাটি, (তার সঙ্গে হাড় আর পাথরের কোনো ধাতু নেই) সামগ্রীর এক বিপুল ভাঁড়ার পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির মনুষ্যমূর্তি অত্যন্ত শিল্পিত, এর একটা বিশেষ ধরন, নারীঅঙ্গকে প্রকট করা। উর্বরতার প্রতিমূর্তি (দেবীমাতা) হতে পারে এটি, প্রাচীন কৃষিজীবী গোষ্ঠীগুলোকে প্রায়শই এমনি এক ঈশ্বরে নিবেদিত হতে দেখা যায় (3.6 নং ছবি)। পোড়ামাটির বালাও তৈরি হতো তার সঙ্গে হাড়ের আর শঙ্খের।

প্রায় ঐ একই সময়কালে (খ্রী পূ 3,800 থেকে 3,200 পর্যন্ত) সিন্ধুর তীর ঘেঁষে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমী ঘরানার একটি নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি দেখা যায়; হস্তশিল্পের নামানুসারেই যার নাম 'হাক্রা পণ্য'-এর সংস্কৃতি। এর ঘনসন্নিবিষ্ট অঞ্চলগুলো রয়েছে বাহাওয়ালপুর জেলার অনেকগুলি অংশে, তার সঙ্গে অধুনা-শুকিয়ে-যাওয়া হাক্রা নদীর ব-দ্বীপ এলাকার অনেকগুলি স্থানে;অর্থাৎ অন্তত বর্ষার মরসুমেও সে নদী ঐ স্থান পর্যন্ত তার স্রোতধারা বয়ে আনতো (3.1 নং টীকা)। পশ্চিম পাঞ্জাবের রবি নদীর পুরোনো খাতে অবস্থিত জলিলপুরে অবশ্য এই 'হাক্রা পণ্য' সংস্কৃতির প্রধান স্থানগুলো খনন করা হয়েছে। জলিলপুরের পশুহাড়ে দেখা যায় গৃহপালিত গরুমোষই মাংসের প্রধান উৎস (90 শতাংশের বেশি)। কাজেই শিকারের ওপর ওখানকার মানুষজন খুব সামান্যই নির্ভর করত। অন্যদিকে হাক্রার তীরবর্তী জনগোষ্ঠী সম্ভবত অস্থায়ী প্রকৃতির

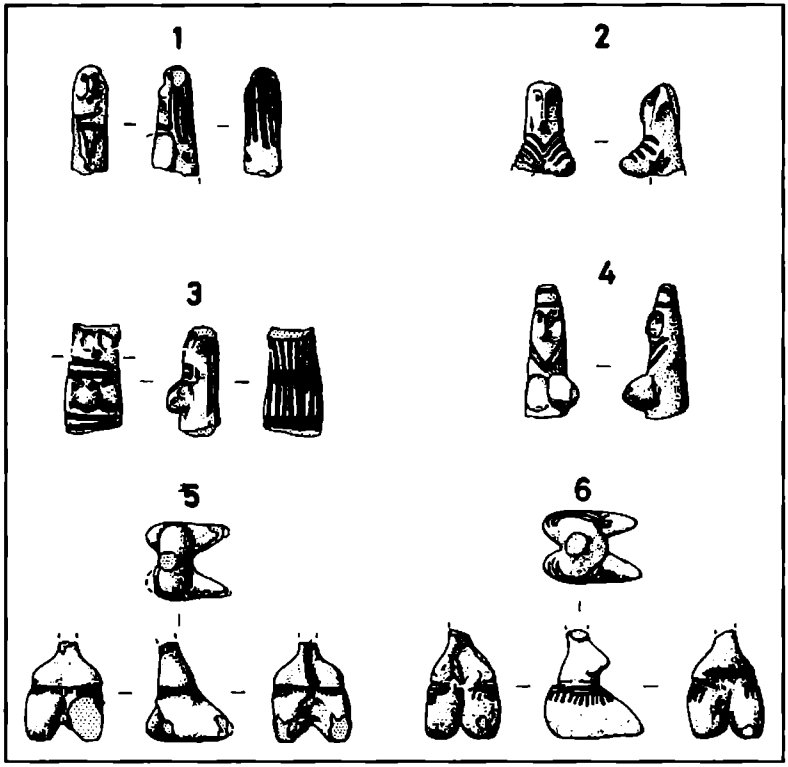

চিত্র 3.6 মনুষ্যাকৃতি মাটির মূর্তি, শেরি খান তারাকাই
(ফরিদ খান এবং অন্যান্যদের অনুসরণে জি. পসেহল থেকে)

আধা-যাযাবর ছিল, যারা প্রধানত পশুপালনের ওপর নির্ভর করত, খুব সামান্য পরিমাণে স্থানান্তর (stifting) কৃষিকাজও করত তারা। যে ধরনের মরুময়, ছোট ছোট ঝোপে-ভরা পরিবেশে তারা বাস করত তার সঙ্গে এটা বেশ মানানসই ছিল।

3.4 ধান উৎপাদন এবং মধ্য ও পূর্ব ভারতের নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি (ক্র.) খ্রী পূ 3,000 সালের পর

সমাজ বিকশিত হয় অসমভাবে। প্রায় 7,000 খ্রী পূর্বাব্দে মেহরগড়ে প্রথম খুঁজে পাবার পর প্রায় 4,000 বছর পর্যন্ত সিন্ধু অববাহিকার বাইরে ভারতবর্ষের আর কোনো অঞ্চলে নব্যপ্রস্তর যুগের কারিগরি আর কৃষি উৎপাদন শুরু হয়নি এই তথ্য যখন আমরা মেনে নিই তখন উপরের বক্তব্যের সত্যতা আমাদের বয়ে বেড়াতে হয়।

থর মরুভূমির ঠিক পরে, মধ্য গুজরাটের লাংঘনাজ (Langhanaj)-এর মাইক্রোলিথ শিল্পের কার্বন নির্ণীত বয়স খ্রী পূ 2,550-2,185। আরো উত্তরে হলো বাঘোর অঞ্চল, মেওয়ারের আরাবল্লীর উচ্চতায় অবস্থান করে থরের দিকে চেয়ে আছে; খুঁজে-পাওয়া এই দুটি যুগপর্ব চলেছিল খ্রী পূ 5365 থেকে 2315 পর্যন্ত, যদিও তার শিল্প ছিল পুরোপুরি মাইক্রোলিথিক। তামা আর মৃৎশিল্প বাঘোরে এসেছে কেবলমাত্র 2650 খ্রী পূর্বাব্দের পরে দ্বিতীয় পর্বে। প্রথম পর্বে যেসব প্রাণীদের পোষ মানানো হয়েছিল তাদের মধ্যে ভেড়া, ছাগল, 'জেবু' যাড় আর শুয়োর ছিল তবে ভেড়া আর ছাগলেরই দাপট ছিল বেশি যাঁতা পাওয়া গেছে, কিন্তু কোনো শস্য দানা পাওয়া যায়নি কাজেই বাসিন্দারা শস্যদানা চাষ করতে আদৌ জানতো কি না সে বিষয়ে খুব একটা নিশ্চিত হওয়া যায় না। তাদের মেষপালক গোষ্ঠী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। 2.5 অধ্যায়ে মেসোলিথিক সংস্কৃতির টিকে থাকার একটা চিহ্ন হিসেবে যেমন (ক্র.) 6000 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে নর্মদা উপত্যকায় অবস্থিত একটা প্রধান অঞ্চল হিসেবে আদমগড়ের কথা আমরা বলেছি, ল্যাংঘনাজ আর বাঘোরের মেসোলিথিক ভূখণ্ডকে সেইরকম একটা অঞ্চল বলে মনে করা হয়।

কিন্তু আরো পূর্বদিকে, পশ্চিমের নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির সঙ্গে কোনো আপাত যোগসূত্র ছাড়াই, নব্যপ্রস্তর যুগের কারিগরির একটা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন বিস্তৃতি ঘটেছিল বলে মনে হয়। আগে বিশ্বাস করা হতো যে, এই নব্যপ্রস্তরযুগীয় উদ্দীপনার কেন্দ্র ছিল মধ্য ভারত; এলাহাবাদের দক্ষিণে বোলানের ছোট বিন্ধ্যায়ন নদীর উপত্যকায় অবস্থিত কোলদিহওয়ায় গৃহে ব্যবহৃত চালের দানা আবিষ্কার করেছেন জি. আর. শর্মা আর তাঁর সহকর্মীরা। কার্বন পরীক্ষায় এই চালের যে সময় পাওয়া গেছে সেটা 6719 থেকে 5010 খ্রী পূর্বাব্দের মধ্যে, নব্যপ্রস্তর যুগের স্তরে পাওয়া অন্যান্য সামগ্রীর বয়সও ঠিক তাই। সে অর্থে, পৃথিবীতে চালের সর্বপ্রাচীন ব্যবহারের চিহ্ন পাওয়া গেছে এই অঞ্চলেই। সত্যি বলতে কি, অনেক পাঠ্যপুস্তকেই এই বিবৃতি খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, কোলদিহওয়ার যে বয়স ধরা হয়েছিল সেটা আসলে কার্বন-সমৃদ্ধ স্তরের একটা ভুল-পাঠ; সংস্কৃতির সঠিক কালপঞ্জীটি নীচে যেমনভাবে দেওয়া হল ওরকমই মনে হয়।

সর্বপ্রথম, বেলান নদীর ঐ ছোট্ট উপত্যকায় চোপনি মাণ্ডোতে একটু পরের দিকের মধ্যপ্রস্তর যুগ কিংবা উচ্চ-নব্যপ্রস্তর যুগের পর্ব, কার্বনকাল নির্ণয়ে এর বয়স হলো 3385-3135 খ্রী পূ। মানুষজন কুঁড়ে ঘরে বাস করতো, মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মাইক্রোলিথ পাওয়া গেছে। তারা ছিল শিকারী ও খাদ্যসংগ্রাহক; কাজেই পুরুষেরা ছিল বেশ শক্তিশালী, সরাই নাহার রাই আর মহাদহা-র পাঁচ হাজার বছর আগেকার মানুষদের মতো বেশ লম্বা; যদিও নারীরা ইতিমধ্যেই আকারে ছোটো হতে শুরু করেছে (পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দৈর্ঘ্য 162 সেমি) আর বেশ ছিপছিপে তারা। উত্তর

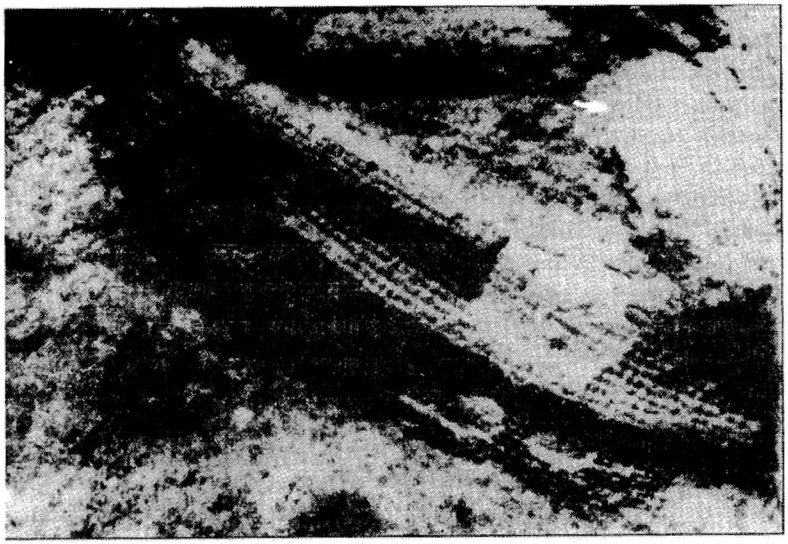

চিত্র 3.7 কাদামাটিতে ধানের তুঁষের ছাপ, চোপনি মাণ্ডো, তৃতীয় পর্যায়
(ছবি জি. আর. শর্মা)

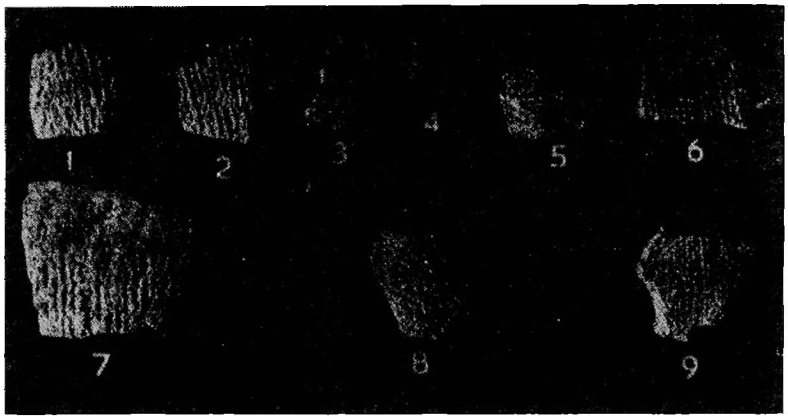

চিত্র 3.8 সুতোর ছাপের মৃৎশিল্প, মহাগড়
(ছবি জি. আর. শর্মা)

প্রদেশে মির্জাপুর জেলার লেখাহিয়ায় (ক্র.) 3035-2780 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের যে কঙ্কালগুলো পাওয়া গেছে তারাই এসব কথা আমাদের জানিয়েছে। তখনো আয়ু ছিলো খুব কম; মোটামুটি যাদের বয়স নির্ণয় করা গেছে এরকম 19 টি কঙ্কালের মধ্যে এগারোটি 25 বছর পূর্ণ হবার আগেই মারা গেছে। আবার চোপনি মান্ডোর কথায় ফিরে আসা যাক। এখানে আমরা পাথুরে হাতুড়ী, জাঁতা, আর হামানদিস্তার মতো মসৃণ পাথরে তৈরি কয়েকটি যন্ত্র পেয়েছি। কিন্তু বুনো চাল জড়ো করার প্রমাণ পেলেও উদ্ভিদ বা পশু গৃহে পালন করার কোনো চিহ্ন এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি (পোড়া মাটির পাত্রে চালের তুঁষের চিহ্ন দেখতে হলে 3.7 নং ছবি দেখতে হবে)। হাতে তৈরি মাটির পাত্র দেখা যাচ্ছে, কোথাও কোথাও তার গায়ে সুতো দিয়ে চিত্রবিচিত্র করা। কুঞ্জহান নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, কোলদিহওয়া আর মহাগড়ে 'বিন্ধ্যায়ন নব্যপ্রস্তর যুগ'-এর যে সংস্কৃতি তার সঙ্গে এর বেশ যোগ আছে। মহাগড় জায়গাটি চোপনি মাণ্ডোর খুবই কাছে। খ্রী পূ 3000-এর কাছাকাছি সময়ে চোপনী মাণ্ডোর মধ্যপ্রস্তর যুগ-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সুবাদে 'বিন্ধ্যায়ন নব্যপ্রস্তর যুগ' আসতেই পারে। কুঞ্জহান নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার কার্বন নির্ণীত সময়কাল খ্রী পূ 3530 থেকে খ্রী পূ 1265, যেখানে মেহরগড়ের সময়সীমা ঐ খ্রী পূ দ্বিতীয় শতকে অর্থাৎ খ্রী পূ 1770-1375, এখানেই আটকে আছে। নিশ্চিতভাবেই বিন্ধ্যায়ন নব্যপ্রস্তর যুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, এখন ভারতবর্ষের যে প্রধান খাদ্য চাল, তারই কৃষিকাজের খুব ভালো প্রমাণ আছে সেখানে, একথা আমি আগেই বলেছি। এই সংস্কৃতির অন্যান্য সব আদিম বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করেছে তার সূতায় চিত্রিত মাটির পাত্র, অবশ্য তখনো ওগুলো হাতেই তৈরি হচ্ছিল (3.8 নং চিত্র)।

পশ্চিমের নব্যপ্রস্তর যুগের সমান্তরালে পূর্বদিকে, একটা দীর্ঘাকার পূর্বীয় নব্যপ্রস্তর যুগ অঞ্চলের অনেক সূত্র পাওয়া সম্ভব। পূর্বদিকের এই লম্বা ফালিটা ধরে আরেকটু এগোলে আমরা চীনে পৌঁছে যাবো আর সেখানে প্রায় 5000 খ্রী পূর্বাব্দে নিশ্চিতভাবেই ধানের চাষবাস শুরু হয়ে গিয়েছিল; সে সময়ে হেমুণ্ডু সংস্কৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে সুতোয় চিত্রবিচিত্র করা মাটির পাত্র। আবার প্রায় 5000 খ্রী পূ, কিংবা তার একটু পরে, ভিয়েতনাম আর থাইল্যান্ডের হাও-চিন-হিয়ান সংস্কৃতির একেবারে শেষতম স্তরে দুটোই পাওয়া গেছে— চাল আর সুতোয় চিত্রবিচিত্র করা মাটির বাসনকোসন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্ভাব্য যোগাযোগের বিষয়ে রেখাপাত করেছে আসামের নব্যপ্রস্তর যুগের অঞ্চলগুলো। দেহজলি হেডিং (উত্তর কাছাড় পর্বতশ্রেণী) আর সরুটারু (কামরূপ জেলা)-তে শস্যদানা গুঁড়ো করার জন্য কিংবা শান দেবার জন্য ব্যবহৃত নানান যন্ত্র পাওয়া গেছে, সঙ্গে আছে সুতোর চিত্রবিচিত্র করা হাতে তৈরি মাটির পাত্র। দুর্ভাগ্যবশত এর কালনির্ণয় সম্ভবপর হয়নি। পশ্চিমবাংলায়, পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে (বর্ধমান জেলা), নব্যপ্রস্তর যুগের প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই পর্যায়েরই চিহ্ন আছে।

প্রথম পর্যায়ে সম্ভবত খ্রী পূ 2000 অব্দের আগে, সেখানে রয়েছে আবাদ করা ধান, আর সুতোয় চিত্রবিচিত্র মাটির সামগ্রী। দ্বিতীয় পর্যায়ে নতুন একদল বসতি স্থাপন করতে শুরু করল; সেখানে ধান ছিল, কুমোরের ঘূর্ণিপাক বা চাকাও ছিল। সিন্ধু অববাহিকার থেকে কারিগরির ছড়িয়ে পড়ার ফলেই এই ধরনের মৃৎশিল্প দেখা গিয়েছিল বলে মনে হয়। সিন্ধু অববাহিকাতে 2000 বছর আগেই এর দেখা পাওয়া গেছে। পূর্বদিকের দেশ থেকে ধানের কৃষিকাজ ছাড়িয়ে পড়ার অন্তিম বিন্দু হলো সুতোয় চিত্রবিচিত্র করা মাটির পাত্র সমৃদ্ধ এই বিন্ধ্যায়ন নব্যপ্রস্তর যুগ। এরমধ্যে আসামের অঞ্চলগুলো আর প্রথম পর্যায়ের পাণ্ডু রাজার ঢিবি— দুটি তাৎপর্য্যময় স্তরের চিহ্ন বহন করে।

পাণ্ডু রাজার ঢিবির দ্বিতীয় পর্যায়ে একটু এগিয়ে যাওয়া নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির সঙ্গে বিহারের সারন জেলার চিরান্দের সংস্কৃতির তুলনা করা যায়। এখানে প্রথম পর্যায়ের সময়কাল খ্রী পূ 2100 থেকে খ্রী পূ 1400 —এই কালসীমার মধ্যে হওয়া সম্ভব। এই পর্যায়ে পাই নব্যপ্রস্তরযুগের যন্ত্রসামগ্রীর বিচিত্র সম্ভার। এর পোড়া শস্য দানা আমাদের জানায় যে, সেখানকার মানুষ কেবলমাত্র ধানের চাষ করত না, তার সঙ্গে ছিল গম, বার্লি আর ডাল (মুগ, মুসুর ইত্যাদি)। বুনো নলখাগড়ার তৈরি কুঁড়েতে তারা থাকত বটে, কিন্তু তাদের আপাত "সমৃদ্ধি" দেখা যায় তাদের ছোট ছোট পাথরের সামগ্রীতে আর পুঁতিতে উপকরণ হিসাবে বেশ মূল্যবান পাথরের (Chalcedony, agate ইত্যাদি) উপস্থিতিতে। মাটির পাত্রগুলো প্রধানত হাতে তৈরি কিন্তু তাদের গায়ে এখন চকচকে পালিশ আর আলপনা; কোথাও কোথাও ঘোরানো চাকে বানানো বাসনকোসনও রয়েছে।

নানা উদ্ভিদের, বিশেষ করে ধানের এই চাষবাসে আমাদের মনে এরকম কোনো ধারণা যেন কোনোমতেই তৈরি না হয় যে, গঙ্গা উপত্যকায় অবস্থিত নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব সঙ্গে সঙ্গে বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই উপত্যকা নিশ্চয়ই ঘন বনে ঢাকা ছিল (1.4 নং ছবি) আর প্রতিটি বসতি ঘিরে পরিষ্কার-করা চাষের জমির একটা বলয় ছিল। শুখা মরসুমে গাছপালায় আগুন লাগিয়ে যে জমিগুলো পরিষ্কার করা হলো, সেই প্রত্যেকটি ভূখণ্ডে কয়েক বছর চাষ করা হত আর তারপর সেটা পরিত্যক্ত হতো। নতুন পরিষ্কার করা জায়গায় কৃষিকাজ তার ঠাঁইবদল করতো। এখন একে বলা হয় 'জুম' বা কাটা ও পোড়ানো (slash-and burn) পদ্ধতি, এখনো অনেক অরণ্যচারী আদিম গোষ্ঠী এই পদ্ধতিতে চাষ করে। শিকার আর মাছধরার জায়গা অনেকটাই দখল করে নিয়েছিল উদ্ভিদ-খাদ্য (plant-food)। কাজেই চিরাগু-এ হাতি, গণ্ডার, বুনো শুয়োর আর হরিণের সঙ্গে এমনকি ষাঁড় আর মোষের হাড়ও পাওয়া গেছে (অবশ্য শেষের দুটো বুনোও হতে পারে)। লাঙল কিংবা পশুতে টানা দু চাকার গাড়ি কোনোটার সঙ্গেই তাদের পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না, গৃহপালিত পশু এবং ভেড়া, ছাগল,

শুয়োর এদেরও মাংসের জন্য নিশ্চয়ই আলাদা করে রাখা হতো। কাজেই বিপুল পরিমাণে ধান চাষ করার মতো অবস্থায় পৌঁছোতে যে আরো অনেক পথ হাঁটতে হয়েছিল সেটা বুঝতে পারা যায়। তবে গাঙ্গেয় সমভূমি জুড়ে পুরোদস্তুর কৃষিজীবী গোষ্ঠী সম্ভবত নিজেরাই ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল।

3.5 উত্তরাঞ্চলে এবং প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি (ক্র.) 3000 খ্রী পূর্বাব্দের পর

এখনো আরো দুটো নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির বর্ণনা বাকি রয়ে গেছে প্রথমটা উত্তরে, কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে আর অন্যটা দক্ষিণে, প্রধানত কর্ণাটকে। উভয় সংস্কৃতিই শুরু হয়েছিল প্রায় 3000 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে; অর্থাৎ বিন্ধ্যায়ন সংস্কৃতি শুরু হবার প্রায় একই সময়ে। যতোদূর পর্যন্ত আমরা বিচার করতে পারি তাতে বলা যায় যে, এদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া নেহাতই কাকতলীয়! এই তিনটি সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় হয়েছিল এমন কথা জানা নেই।

উত্তরের নব্যপ্রস্তর যুগের অঞ্চলগুলোর মধ্যে দুটো প্রধান অঞ্চল রয়েছে কাশ্মীর উপত্যকায়— বুর্জাহোম আর গুফক্রল-এ। খ্রী পূ 2800 থেকে 2500 এই সময়কালের মধ্যে বুর্জাহোম-এ মৃৎশিল্পের জ্ঞান ছাড়াই যে একটা প্রাচীন নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল, সে বিষয়ে যুক্তিসংগতভাবে আমাদের নিশ্চিত করার জন্য কার্বন কাল নির্ণয় পদ্ধতিতে পাওয়া যথেষ্ট সন তারিখ আমাদের হাতে আছে। এরপরেই এলো প্রধান নব্যপ্রস্তর যুগের পর্যায়টি। খ্রী পূ 2500 থেকে খ্রী পূ 2000-এর মধ্যে সেখানে হাতে-তৈরি অনুজ্জ্বল, সুতোয় চিত্রবিচিত্র করা আর সেই সঙ্গে রঙ-করা মাটির সামগ্রী দেখা গিয়েছিল। করেওয়া (karewas)-র ওপরে স্বাভাবিক গহ্বরে (Pit) বা প্রাকৃতিক পলিজ উচ্চভূমিতে বহতা নদীকে উপেক্ষা করেই তারা বাস করত। ব্যবহার করত মসৃণ পাথরের আর রকমারি হাড়ের যন্ত্র। প্রাথমিক পর্যায়ে শিকার করেই তারা মাংসের চাহিদা পূরণ করত; কিন্তু পরে যখন গবাদি পশু ভেড়া, ছাগল, মোষ, শুয়োর আর কুকুরকে গার্হস্থ্যের আওতায় আনতে পারল, তখনি সম্ভবত পশুচারণ ধীরে ধীরে শিকারের দাপট অনেকটা কমিয়ে দিল। তারা কৃষিকাজও করত। সেখানে মাটি চাষ করার যে ছুরি পাওয়া গেছে তাতেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। গম, বার্লি, ডাল আর কড়াইশুঁটি উৎপন্ন হত আর পরের দিকে নব্যপ্রস্তরযুগের পর্যায়ে, খ্রী পূ 2000 থেকে খ্রী পূ 1500 এই সময়কালে চাল পাওয়া গিয়েছে।

অসংখ্য ধর্মীয় আচার আর প্রথা ছিল তাদের। মৃতদেহগুলো খোলা আকাশের নীচে ফেলে রাখা হতো, তারপর কেবল হাড়গুলো যখন থাকত, তখন তাদের সংগ্রহ করে মাটিতে পোঁতা হতো; প্রায়শই তাদের গিরিমাটির রঙে রাঙানো হতো। মাটিতে পোঁতা কুকুরের হাড় থেকে বোঝা যায় কুকুর-বলিও চলত। পাথরের ওপর অসংখ্য

পরস্পরছেদী রেখার যে জটিল আঁকাবুকি পাওয়া গেছে, তার অবশ্যই কোনো ধর্মীয় তাৎপর্য আছে। একটা পাথরের চাঙড়ের ওপর হিজিবিজি রেখায় আঁকা দৃশ্যটিরও নিশ্চয়ই একইরকম তাৎপর্য আছে এতে দেখা যাচ্ছে দুটি মানুষ (একজন নারী, একজন পুরুষ) একটি পুরুষ-হরিণকে হত্যা করছে, তাদের একজনের হাতে (নারীর) বর্শা আর একজনের (পুরুষের) হাতে তীর-ধনুক, মাথার ওপরে দুটো সূর্য্য আর একটা কুকুর দৃশ্যমান (3.9 নং ছবি)।

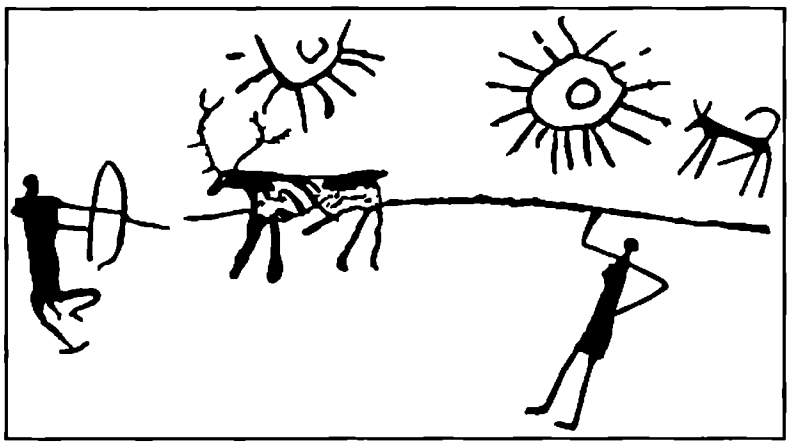

চিত্র 3.9 পুরুষ-হরিণ শিকারে বল্লম আর তীরের ব্যবহার, বুর্জাহোম, পর্যায় IB, দুটো সূর্য আর (বুনো?) কুকুর লক্ষ্যনীয় (বি. এম. পাণ্ডে অনুসরণে, জি. পসেহল থেকে)

বহুল দানসামগ্রী যার মধ্যে আছে শাখাপ্রশাখাযুক্ত হরিণের শিং, সাজি মাটির সামগ্রী, পুঁতি লাগানো পাত— সমস্ত কিছু সমেত একজন মানুষকে সমাধিস্থ করা হয়েছে— তার মাথার খুলির হাড়ে সাতটি গর্ত। এই অদ্ভুত রীতিকে বলা হয় ট্রিপ্যানিং (trepanning or trephining) অর্থাৎ ছেঁদা করার একটা যন্ত্র দিয়ে খুলি ফুটো করা। এশিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতিতেও এই রীতি দেখা যায়। ট্রিপ্যানিং হলো আমাদের জ্ঞানে শল্যচিকিৎসার দুনিয়ায় মানুষের প্রথম সচেতন প্রচেষ্টা; যদিও এর ভিত্তিতে ছিল নিছক একটা কুসংস্কার যে এইভাবে মানুষের শরীরকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে তার ভেতরে যে অশুভ শক্তি বাসা বেঁধেছে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া, কিংবা অন্য একটা ভুল তত্ত্ব যে এইভাবে মাথার ভেতরে যে আভ্যন্তরীণ চাপ তাকে সহজ করে দেওয়া। সে যাই হোক, আশ্চর্য্যের বিষয় হলো পাথরের যন্ত্র দিয়ে এই রকম অস্ত্রচিকিৎসার পরও মানুষ বেঁচে থাকত।

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের কাছে সরাই খোলা পর্যন্ত উত্তরের নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়, কেননা সেখানকার নব্যপ্রস্তর যুগের কার্বন-কাল নির্ণীত হয়েছে খ্রী পূ 3360 থেকে 2525 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে। পাঞ্জাবেও হিমালয় পার্বত্যমালার পাদদেশ ব্যেপে আরো অনেকগুলো এরকম অঞ্চল থাকার সম্ভাবনা আছে। ঘালিঘাই (ক্র. খ্রী পূ 3000 খ্রী পূ 1900)-এ সোয়াত নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির (NWEP, পাকিস্তান) যে নিদর্শন মেলে, হাতে-গড়া মাটির সামগ্রী দিয়ে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপরে তার মৃৎশিল্পের শৈলী বিচার করে মনে হয় পরবর্তী পর্যায়ে বুর্জাহোম-এর সঙ্গে কোনোভাবে তার সংযোগ তৈরি হয়েছিল। নব্যপ্রস্তরযুগের প্রাচীনতম পর্যায় থেকেই সোয়াত উপত্যকায় গম আর বার্লি জন্মাতো বটে, কিন্তু ধানের গার্হস্থীকরণ (Domestication) অর্থাৎ ধান চাষ গৃহস্থালীর অন্তর্ভুক্ত হলো অনেক পরে, 1900 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পরের সময়ে।

পূর্বের সংস্কৃতির বৈসাদৃশ্যে, উত্তরের নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির সঙ্গে সিন্ধু অববাহিকার সংস্কৃতি যেমন, কোট দিজিয়ান, তাছাড়া খ্রী পূ তৃতীয় শতাব্দের বেশ পরিণত সিন্ধু অঞ্চল— এদের নিঃসন্দেহে কিছু যোগসূত্র ছিল। কিন্তু বস্তুনির্ভর সংস্কৃতিই হোক কিংবা শিল্প কি ধর্মীয় প্রথা প্রতিটি ক্ষেত্রে উভয় সভ্যতারই নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্বাধীন চলন ছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলোতে, এশিয়ার একটু ভেতরদিকের নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের সংস্কৃতির অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা দেখতে পাওয়া যায়। আর উত্তর চীনের (খ্রী পূ 5100 থেকে খ্রী পূ 2900 অব্দের) ইয়াং সাও সংস্কৃতির সঙ্গেও তার সাদৃশ্য বেশ লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত প্রাচীন সংকেত আমাদের আবারো সেই একই কথা জানিয়ে দেয় যে, স্মরণাতীত কাল থেকে বহির্বিশ্বের সমস্ত

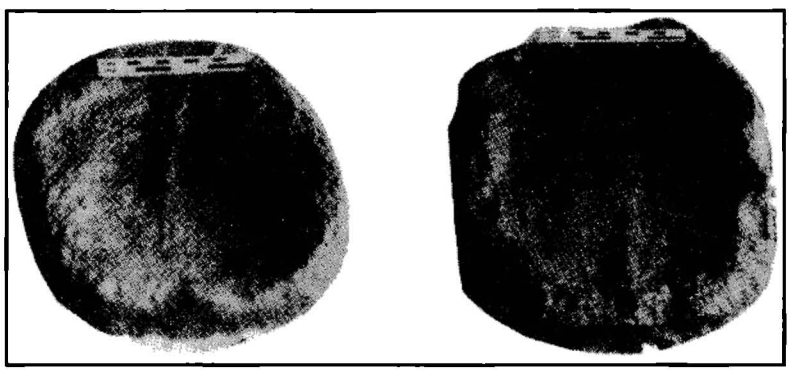

চিত্র 3.10 খোঁয়াড়ের ছাইগাদায় গবাদিপশুর খুরের ছাপ, উটনুর
(ছবি বি. এবং আর. অলচিন)

দিক থেকে নানান প্রভাব আত্মস্থ করার এই যে ধারাবাহিকতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখতে পাই, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সে কিছু কম নয়।

এখনো পর্যন্ত যতখানি বিচার বিশ্লেষণ করা গেছে, তাতে বলা যায়, নব্যপ্রস্তর যুগের যে সংস্কৃতি উৎসের দিক থেকে সম্ভবত পুরোপুরি দেশীয় ছিল তা হলো দক্ষিণের সংস্কৃতি। আধুনিক কর্ণাটক রাজ্য আর তার সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ আর তামিল নাড়ুর কিছু অংশ যোগ করলে যে অঞ্চল পাওয়া যাবে সেটাই ছিল প্রধানত দাক্ষিণাত্যের নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির বিচরণ ক্ষেত্র। কোডেকাল আর উটনুরে পাওয়া কার্বন-কাল থেকে এর প্রারম্ভকাল প্রায় 3000 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ বলে মনে করা হয়। প্রাথমিক যে পর্যায়টি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু সেটি টিকেছিল প্রায় 2100 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত। পাথরের কুড়াল, শানদেবার পাথর আর জাঁতা— এদের থেকে বোঝা যায় যে, কৃষিকাজ শুরু হয়ে গেছে, যদিও সেখানে কোনো দানাশস্যের খোঁজ মেলেনি। গবাদি পশু, ভেড়া আর ছাগল গৃহস্থালীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে, পশুর মল আর ছাইয়ের ঢিপি দেখে বোঝা যায় পশুদের একই খোঁয়াড়ে আটকে রাখা হতো (3.10 নং চিত্র)। মাটির সামগ্রী পুরোপুরি হাতে গড়া হলেও কোনো একধরনের আদিম ঘুরনচাকের মতো (কুমোরের দ্রুত ঘুরনচাকি নয়) কিছুতে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে সেগুলোকে কোনো কোনো জায়গায় একটু গোলাকৃতি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

3.1 নব্যপ্রস্তর যুগীয় বিপ্লবের ক্রমপঞ্জী

খ্রী পূ	
10,000–9,000	প্রাচীনতম নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়ার নাটুফিয়ান
10,000–7,5000	নব্যপ্রস্তরযুগের সংস্কৃতি, উত্তর আফগানিস্তান মৃৎশিল্প-পূর্ব
7,000–5,000	নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি, মেহরগড়, প্রথম পর্যায় মৃৎশিল্প-পূর্ব; বার্লি, গম উৎপাদিত হয়েছে
5,365–2650	বাঘোর মধ্যপ্রস্তর যুগ (Mesolithic), প্রথম পর্যায়, মৃৎশিল্প-পূর্ব
5,000	চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ধানের গার্হস্থীকরণ
5,000–4,000	মেহরগড়, দ্বিতীয় পর্যায় হাতে গড়া মাটির সামগ্রী কার্পাস চাষ
4,300–3800	মেহরগড়, তৃতীয় পর্যায় তামা-গলানো 'টোগু' মৃৎশিল্প
4,000	মেহরগড়, কুমোরের চাক
3,800–3,200	নব্যপ্রস্তর যুগের কেচি-বেগ আর হাক্রা-পণ্য সংস্কৃতি ঘুরনচাকে তৈরি মৃৎশিল্প

3,385–2,780	বেলান মধ্যপ্রস্তর যুগ হাতে তৈরি মৃৎশিল্প
3,500–1,200	বিন্ধ্যায়ন নব্যপ্রস্তর যুগ প্রধানত হাতে তৈরি মৃৎশিল্প ধান চাষ
3,000–2,100	দক্ষিণ ভারতের নব্যপ্রস্তর যুগ প্রধানত হাতে তৈরি মৃৎশিল্প
3,000–1,900	সোয়াত নব্যপ্রস্তর যুগ মৃৎশিল্প গম, বার্লির চাষ
2,800–2,500	উত্তরাঞ্চলের (কাশ্মীর) নব্য প্রস্তর যুগ, প্রথম পর্যায় মৃৎশিল্প-পূর্ব
2,500–2,000	উত্তরাঞ্চলের (কাশ্মীর) নব্যপ্রস্তর যুগ, দ্বিতীয় পর্যায় হাতে তৈরি মৃৎশিল্প; গম, বার্লি, ডালের চাষ
2,500(?)–2,000	পূর্বাঞ্চলের নব্যপ্রস্তর যুগ, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, প্রথম পর্যায়, হাতে তৈরি মৃৎশিল্প; ধান চাষ
2,100–1,400	নব্যপ্রস্তর যুগের চিরাণ্ড, প্রথম পর্যায়;হাতে তৈরি মৃৎশিল্প, ধান চাষ

টীকা কার্বন নির্ণীত কাল অনেক সময় একে অপরের ওপর সমাপতিত হয়েছে, সেগুলোর আর মীমাংসা হয়নি। ঘটনার ক্রমপঞ্জী যেহেতু নির্দিষ্ট, তাই বিন্ধ্যায়ন নব্যপ্রস্তর যুগের সময়কাল কার্বন তারিখে প্রাচীনতর হলেও তালিকায় বেলান মধ্যপ্রস্তর যুগকে তার আগে রাখা হয়েছে।

টীকা 3.1 মরুর হারানো নদী

প্রধানত মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে যেসব জলবায়ু অঞ্চলে অধঃক্ষেপণ ঘটে, তাদের আজকে আমরা যেরকম দেখি, তার প্রকাশ যে ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে, ভূ-তাত্ত্বিক কাল হলোসিনের সূচনাপর্বে সে কথায় এখন আর কারোর সন্দেহ নেই। অবশ্য প্রায়ই এ কথা বলা হয় যে, এর মধ্যে উষ্ণ এবং শীতল কিংবা শুষ্ক এবং আর্দ্র কালপর্বও ছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আজ প্রায়শই সরস্বতী নদী বিষয়ে আলোচনায় যেসব প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, যেসব তত্ত্ব সন্ধান করা হচ্ছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেটিকে মরুর 'হারানো নদী' হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। আমাদের জলবায়ু সংক্রান্ত বেশিরভাগ চিন্তাভাবনার সঙ্গে এখন এটি যুক্ত।

দেখা যাচ্ছে যে, শতদ্রু থেকে যমুনার মধ্যবর্তী সমভূমিতে প্রবাহিত সমস্ত নদীই, শিবালিক বা নিম্ন হিমালয়ের ঢাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কাজেই এদের প্রবাহ অবশ্যই বৃষ্টির জলে পুষ্ট। এদের বেশিরভাগই ছৌতং (Chautang) এবং ঘগ্গর (Ghaggar) এই দুটি প্রধান নদীর শাখানদী ছিল। আজ, পশ্চিমী রাজস্থানের থর মরুভূমিতে পৌঁছাবার অনেক আগে দুটি নদীই পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে। চৌতং-এর শুকনো খাতটি পশ্চিম অভিমুখে হরিয়ানা থেকে রাজস্থানে প্রবাহিত। সেখানে তার সঙ্গে মিলেছে ঘগ্গর-

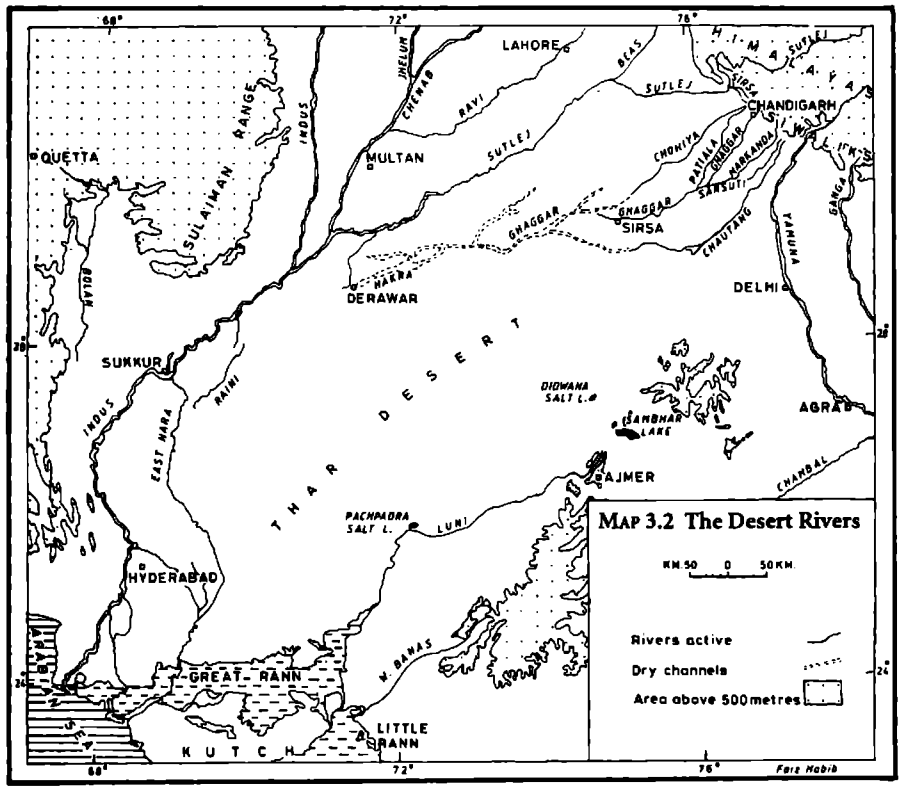

MAP 3.2 The Desert Rivers

এর শুকনো খাত; আমাদের সরস্বতী একদা এরই একটি শাখানদী ছিল। আরো পশ্চিমে পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুর জেলায় প্রবাহিত এদের মিলিত খাতটি এখনো চোখে পড়ে সেখানে উত্তরদিক থেকে আসা আরেকটি শুকনো খাত ওর সঙ্গে মিলিত হবার পর ধারাটি 'হাক্রা' নামে পরিচিত হলো। ঐ জেলারই দেরাওয়ার-এর কাছে এই ধারা ব-দ্বীপের বাহুগুলোর মতো শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছিল। সিন্ধ-এর পূর্ব-নারা আর এই স্রোতের মধ্যে কোনো যোগসূত্র দেখতে পাবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। সিন্ধুনদের শীর্ষদেশের খুব কাছাকাছি প্রবাহিত পূর্ব-নারা দক্ষিণে কচ্ছের রানের দিকে বয়ে গেছে; অতীতে সিন্ধু নদে যখন প্লাবন আসত তখন সেই জল নির্গমনের পথ হিসেবে এটি কাজে লাগতো; প্রাচীনকালে এই গুরুদায়িত্ব নদী অবশ্যই ঠিক ঠিকমতোই পালন করতো (3.2 মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

নানান যুক্তির বিস্তার ঘটছে এখন। বলা হচ্ছে যে, ঘগ্গর, হাক্রা আর নারা, এই তিনটি নদীর শুকনো খাতে সরস্বতী নামে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঋগবেদের শ্লোকে বর্ণিত 'প্রবল স্রোতস্বিনী'-র রূপ ধারণ করে এটি তারপর কচ্ছের রাণের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। যেহেতু শতদ্রু এবং যমুনা একত্রে কিংবা পালাক্রমে একদা এরই শাখানদী ছিল কাজেই 'সরস্বতী' বিষয়ে ওপরের অনুমান যে সঠিক, বেশ জোরের সঙ্গেই এ দাবি তোলা হয়েছে। মাঠপর্যায়ের জরিপের ভিত্তিতে, উপগ্রহ-চিত্রাবলী এই প্রাচীন বিশ্বাসকে আরো জোরদার করে তোলে যে, কয়েকটি পুরনো স্রোত শতদ্রু এবং যমুনা নদীর মধ্য দিয়ে হাক্রা-আহরণ ক্ষেত্রে (catchment area) এসে পড়েছে। দিদওয়ালা এবং রাজস্থানের অন্যান্য লবণ হ্রদ বিষয়ে শ্রী গুরজিত সিং গভীরভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। অতি প্রাচীন কালের অত্যন্ত অনুর্বর পর্যায় 12,000 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পরেই শেষ হয়েছিলো এবং খ্রী পূর্ব 4,420 থেকে খ্রী পূর্ব 2,230 সময়কালের মধ্যে একটি উপ-আর্দ্র পর্যায় ছিলো। উপরের দুটি পর্যায়ের শেষেরটিতে এখনকার তুলনায় মিষ্টিজলের অনেক বেশি প্রাচুর্য ছিল। সেকারণেই এখনকার তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও সে সময় বেশি ছিল এমন যুক্তি দেওয়া হয়। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, অধিক পরিমাণ বৃষ্টির জলে পুষ্ট হয়ে, ঐ আর্দ্র পর্যায়ে সরস্বতী একটি বিশাল নদী হিসেবে প্রবাহিত হতো।

অবশ্য এই দাবির বিরুদ্ধে অকাট্য প্রতিবাদী যুক্তি আছে অসংখ্য। সেই পুরাকাল থেকেই সরস্বতী (মধ্য ও আধুনিক যুগে 'সরসুতি') নামে একটি ছোট্ট স্রোতধারা শিবালিক ঢালে উৎপন্ন হয়ে হরিয়ানার থানেশ্বরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। হিমালয়ের উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন নদীগুলোর বিশালত্বের সঙ্গে এই ছোট্ট নদীর কোনো তুলনাই চলে না। এমনকি ঘগ্গর আর হাক্রার শুকনো খাতের কোনো অংশকেই 'সরসুতি' নামে ডাকা হয় না। অবশ্য, এই খাতগুলো দিয়ে যদি কোনোদিন শতদ্রু কিংবা যমুনার স্রোতধারা প্রবাহিত হতো, তবে এই মিলিত নদীটি 'সরস্বতী নয়' বরং উপরের

নদীদুটির যে কোনো একটির নামে চিহ্নিত হতো। তার ওপর, যমুনা তার পশ্চিম তীরে আগেকার উচ্চতর ধাপের চেয়ে এখন এতো বেশি নীচু খাতে প্রবাহিত হয় যে, অন্তত বিগত দশ হাজার বছরের মধ্যে তার ঘগ্গর অববাহিকায় প্রবাহিত হওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। উপগ্রহ-চিত্র থেকে মনে হয় যেন শতদ্রুর খাতটি ঘগ্গরের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান জলনির্গমরেখা বরাবর নদীটি এমন দুরন্ত উচ্ছাসে বয়ে চলেছে যে, আজকের জল নির্গমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরসুতি আর ঘগ্গর দুটিকেই ধারণ করে সক্রিয় থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, 2,230 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত, সময়ের একটা সুদীর্ঘ পরিসরে বৃষ্টিপাতের পর্যায় চলেছিলো (যদিও পাচপাদ্র লবণ অববাহিকায় একই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এমন একটা সত্য কোনো মতেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না), তাহলে হাক্রা পর্যন্ত বর্তমানের এই শুকনো খাতটি কিভাবে বাঁক নিয়েছিল সেটার একটা ব্যাখ্যা অবশ্য পাওয়া যায়; কিন্তু তাতে হিমালয়ের বরফে-পুষ্ট নদীগুলোর সঙ্গে একই শ্রেণীতে সরস্বতীর নাম লিখে দেওয়া যায় না। কেননা, ঐ নদীগুলোও নিশ্চয়ই সেসময় একইরকমভাবে অনেক বেশি জল সংগ্রহ করে তাদের আহরণ ক্ষেত্রকে আরো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল।

দেরাওয়ারের নিকটে হাক্রা নদীর ব-দ্বীপে, তার বিস্তৃত শাখাগুলোর তীরে তীরে, অনেকটা পরবর্তীকালের সিন্ধু সংস্কৃতির মতো হাক্রা পণ্য-সামগ্রীর এলাকাগুলো অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল। কাজেই নব্য প্রস্তর যুগে (খ্রী পূ চতুর্থ শতাব্দী), হাক্রা নদী যে বাহাওয়ালপুরে অবস্থিত দেরাওয়ারের পরে আর তার জলধারা বয়ে নিয়ে যেতে পারেনি এটা তারই একটা প্রমাণ। অন্যকথায় বললে, বাহাওয়ালাপুরের মরুভূমিতে যেখানে হাক্রার জলধারা শুকিয়ে গিয়েছে, কেবল সেই পর্যন্ত প্রবাহিত হবার মতো পর্যাপ্ত জলের ভাণ্ডারই তার ছিল।

হারানো নদীর আজকের শুকনো খাতে কেন যে তখন জলধারা প্রবাহিত হতো তা বুঝতে গেলে জলবায়ুর বিরাট কোনো পরিবর্তনের কথা ভাবার কোনো দরকার নেই, ভাবতে হবে মানুষের নিজের হাতে-গড়া পরিবর্তনের কথা। মানুষ যতো বেশি অরণ্য আর গুল্মঝোপ কেটে, উপড়ে জমি পরিষ্কার করেছে, ততোই সে জমির জলধারণক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। ফলে, নদী প্রবাহের স্থিতিশীলতাই কেবল কমে গেল তা নয় তার সঙ্গে মাটি অনেক বেশি জল শোষণ করে নেওয়ায় নদীতে জলের মোট পরিমাণও হ্রাস পেল। তারওপর, অরণ্য আস্তরণ কমে যাওয়ার ফলে অধঃক্ষেপণের পরিমাণ ও কমে গেল। 1.3 নং অধ্যায়ে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আর সবশেষে সেচের জলের জন্য পূর্বপাঞ্জাব আর হরিয়ানার স্রোতধারায় আর প্লাবন খাতের স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ তিন কি চার হাজার বছর কিংবা সম্ভবত তারও বেশি সময় ধরে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, এর পরিণতিতে হাক্রা নদীতে জলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কেন যে হাক্রা নদীতে আজ জলশূন্য, কেন যে সেখানে মরা খাত হাঁ হাঁ করছে এসবের ব্যাখ্যা করার জন্য এতক্ষণ যা যা বলা হল সেটুকুই যথেষ্ট।

আর যে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের, তার কথা বলি। স্থলভাগে পুরোনো জলধারার যে চিহ্ন রয়েছে শুকনো খাতে বা বালুর স্তরে কিংবা উপগ্রহ-চিত্রে আমাদের যেগুলো চোখে পড়ে, তার সবগুলো একই সময়কালের নয়। তাদের মধ্যে অনেকগুলো প্লেস্টোসিন কালে সৃষ্ট হয়ে আস্তে আস্তে হলোসিনে শুকিয়ে গেছে। কাজেই ওপরে যে ব্যাখ্যা নিয়ে এতো আলাপ আলোচনা চলছে তার সঙ্গে এদের কোনো সংযোগই নেই।

ঋগবেদের সরস্বতীর প্রশ্নে একটাই মাত্র গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়া যেতে পারে। তা হলো, ঋগবেদে বর্ণিত সুদীর্ঘা সরস্বতী প্রকৃতপক্ষে পার্থিব নয়, এক মহাজাগতিক স্রোতধারা, দেবী সরস্বতীর নদীরূপ। এই প্রসঙ্গে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হচ্ছে যে, ঋগবেদের সরস্বতী বলতে 'সরসুতি' নামে আজকের আধুনিক থানেশ্বরের নদীর কথা বলা হচ্ছে না। এ নদী আসলে সিন্ধু কিংবা আফগানিস্তানের আরঘানদাব-হেলমন্দ (Arghandab Helmand, আর আবেস্তাঁ হারখভাইতি = সরস্বতী, সংস্কৃতের 'S'-এর স্থলে h/kh আবেস্তাঁয় রয়েছে)। একই নামে অনেক নদী আছে এ দেশে ঃ ঘগ্গর, যারমধ্যে সরসুতি বাহিত হয়েছে তার কথাই ধরা যাক। উত্তরপ্রদেশ সমভূমিতে এক বিশাল নদী আছে, হিমালয় থেকে আসা, তার নামও ঘঘরা কিংবা আবার ধরা যাক, সিন্ধ তার মানে সিন্ধু, ঐ নামে মধ্য ভারতে আর কাশ্মীরে অনেক ছোটো ছোটো নদী আছে। ঋগবেদের পরবর্তী অংশে, বিশেষত দশম মণ্ডলের নদী-স্রোতে উল্লেখিত সরস্বতীকে আধুনিক সরসুতি বলেই মনে হয় কেননা ঐ স্তোত্রে যমুনা আর শতদ্রি বা শতদ্রু (sutlej)-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এর স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে তার এই বিশালত্ব কিংবা পবিত্রতার কোনো উল্লেখ নেই। বরং অন্যত্র যেমন সরস্বতীর কথা বলা হয়েছে এখানেও তেমনি সিন্ধুর উদ্দেশ্যে ঐ একই প্রশংসাবাণী বর্ষিত হয়েছে।

3.2 ব্যবহৃত পুস্তকসমূহের টীকা

ভি গর্ডন চাইল্ড ম্যান মেকস হিমসেল্ফ, লন্ডন, 1936 (তার পর অনেকগুলি সংস্করণ) গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর নব্যপ্রস্তর যুগীয় বিপ্লবের তত্ত্বটি উপস্থাপিত করেন। এই ধারণার বিরুদ্ধে উত্থিত নানান বিরোধিতার বিষয়গুলি এখানে আগেই অনুমিত হওয়ায় রচনাটি আজও পড়ে নেওয়া উচিত। তার হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন হিস্ট্রি, পেঙ্গুইন, 1942, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এই অধ্যায়ে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে, সে সম্পর্কে সাধারণভাবে কোনোকিছু পড়তে গেলে, ব্রিগেট ও রেমণ্ড আলকিন-এর দি রাইজ অফ সিভিলাইজেশান ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান, ভারতীয় সংস্করণ, নতুন দিল্লী, 1983, বিশেষ করে এর পঞ্চম অধ্যায় হলো হাতের কাছে পাওয়া সবচেয়ে ভালো লেখা। ঐ

একই লেখক-যুগল তাঁদের ওরিজিনস অফ এ সিভিলাইজেশান, নতুন দিল্লী, 1997 গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ে একেবারে তাজা সমীক্ষা করেছেন। দিলীপ কে চক্রবর্তীর ইন্ডিয়া অ্যান আর্কিওলজিক্যাল হিস্ট্রি, নতুন দিল্লী, 1999 এই বইটির চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ও দেখা যেতে পারে। এই সময়ের প্রসঙ্গে (এবং অন্যান্য সব আদর্শ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গেও) আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন এ ঘোষ, তাঁর অ্যান এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি, 1989-এর দুটি খণ্ডে। প্রথম খণ্ডটির বিষয়বস্তু 'প্রজাকুল' আর দ্বিতীয় খণ্ডটি পুরাতাত্ত্বিক এলাকাগুলির গেজেটিয়ার। এই বইটি নাড়াচাড়া করার সময় মনে রাখতে হবে যে, 1970 সালের পরবর্তীকালে পুরাতত্ত্ববিদরা যা কিছু জানতে পেরেছেন সেসব এখানে উপস্থাপিত হয়েছে আর তাই এরমধ্যে পাকিস্তান আর বাংলাদেশ নেই।

গ্রিগোরি এস পসেহল-এর ইন্ডাস এজ দি বিগিনিংস, নতুন দিল্লী, 1999 গ্রন্থটি ভৌগোলিক বিন্যাস, উদ্ভিদ, প্রাণী ইতিহাস— পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র এবং বালুচিস্তান ও সিন্ধু নদের নব্যপ্রস্তরযুগীয় বিপ্লব— এই সমস্ত বিষয়ে যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি একসাথে গুছিয়ে উপস্থাপিত করেছে। বেশ বিশাল, প্রশংসনীয় পাঠযোগ্য কাজ। নানান বিষয়ে অনেক তাত্ত্বিক এবং পাশাপাশি অপ্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনায় এটি পাঠের পক্ষে বেশ উত্তেজক কিছু হয়ে উঠেছে। একেবারে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণার উল্লেখও এখানে পাওয়া যাবে। মেহরগড়ের প্রথম পর্যায় থেকে হাক্রা পণ্যের পর্যায় পর্যন্ত পসেহল যে কালপঞ্জী বিন্যস্ত করেছেন সেটি আমরা গ্রহণ করেছি, অবশ্য বিভিন্ন স্থানের কার্বন-14 তারিখ থেকে এরকম কোনো ক্রমান্বয়ী একেবারে সোজাসুজি কালপঞ্জী পাওয়া যায় না; কিন্তু সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ থেকে এই কালপরম্পরা আর অনুরণিত ব্যাখ্যাগুলোকে একসাথে পুনর্আলোচনার এই যে প্রচেষ্টা সেটা একটা অত্যন্ত সঠিক কাজ। এইরকমভাবে যেসব অঞ্চলের কার্বন-তারিখ নিরীক্ষার সঙ্গে সোজাসাপটা কালপঞ্জীর যে গোলমাল রয়েছে সে বিষয়ে পুনরায় আলাপ-আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন অনেকে। কার্বন তারিখের জন্য পসেহলের নিজের লেখা রেডিওকার্বন ডেটস ফর সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজি, পেলসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পেনসিলভেনিয়া, 1989 দ্রষ্টব্য।

জি বি শর্মা, ভি ডি মিশ্র এবং আরো সকলের ফ্রম হান্টিং এণ্ড ফুড গ্যাদারিং টু ডোমেস্টিকেশন অফ প্লান্টস এণ্ড অ্যানিমালস, ... এক্সকাভেশান অ্যাট চোপনি মানডো, মহাদহা আর মহাগড়, এলাহাবাদ, 1980। বিন্ধ্যায়নের পরবর্তী পর্যায়ের নব্যপ্রস্তরযুগীয় পর্যায়ের জন্য গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। বইটির একমাত্র ত্রুটি হলো নব্যপ্রস্তরযুগ পর্যায়টির জন্য অসম্ভব অসম্ভব সব কার্বন-তারিখ এটি আত্মস্থ করেছে (এ বিষয়টি মূল রচনার 3.4 নং অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)।

ভারতবর্ষের পুরাতাত্ত্বিক অঞ্চলগুলো সম্পর্কে জানার জন্য একটি প্রধান উৎস

হলো ভারতীয় 'পুরাতত্ত্ব' এ রিভিউ। ভারতবর্ষের পুরাতাত্ত্বিক সার্ভের বার্ষিক জার্নাল এটি; অবশ্য অনেক বছর এগুলো বেরোতে বাকি রয়ে গেছে। এর পাশাপাশি রয়েছে ম্যান এন্ড এনভিরনমেন্ট, পুনে আর পাকিস্তান আর্কিওলজি, করাচীর কয়েকটি খণ্ড, এগুলোও অবশ্য বড়ো অনিয়মিত প্রকাশিত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখনীয় সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজি-র পরপর কয়েকটি খণ্ড (এর জন্য 2.2 নং টীকা দেখতে হবে)।

সরস্বতী নদীর সমস্যা নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। 3.1 নং টীকা মূলত ইরফান হাবিবের 'ইমাজিনিং রিভার সরস্বতী, এ ডিফেন্স অফ কমনসেন্স', সোস্যাল সায়েন্টিস্ট-এ প্রকাশিত, উনত্রিশতম খণ্ড, নং 1-2, নতুন দিল্লী, 2001, পৃষ্ঠা 46-74 রচনার ভিত্তিতে লেখা, যেখানে পুরো বিষয়টার উল্লেখ পাওয়া যাবে।

নির্ঘণ্ট

অ

অধঃক্ষেপণ— ১০, ১১, ৭৪
অপটিক্যালি স্টিম্যুলেটেড সুমিনিসেন্স (OSL) পদ্ধতি— ৪৭
অস্ত্রশস্ত্র ৫৯
  তীরের ফলা ৪০, ৪৩, ৫০
  তীর ধনুক ৪০, ৪৩
  ধনুকের ছিলা ৬০
  বল্লমের আগা ৫১, ৭১
অস্ট্রোলয়েড ৩৭
অস্ট্রালোপিথেসিন ২২
অস্ট্রালোপিথেকাস এ্যাফারেন্সিস ২২, ৪৩
অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস ২২

আ

আখ-কুপরূক ৫৩
আদমের সেতু ৬
আদমগড় (নর্মদা উপত্যকা)
  মধ্যপ্রস্তর যুগের অঞ্চল ৪২, ৬৬
'আর্য' যুগপর্ব ১৭
আলবেরুনীর ভারত-বিবরণ ১৫, ১৯
অন্তঃপ্রজননকারী (প্রজাতি) ৩৬
আফার (ইথিওপিয়া)
  পাওয়া গেছে জীবাশ্ম ৩১
আলাবাঁধ ৮
আরাবল্লী পর্বতমালা ৩, ৭, ১২, ৬৬
আন্নাথিয়ান শিল্প
  প্রাচীন প্রস্তরযুগ (ইরাবতীর উচ্চ উপত্যকা, মায়ানমার) ৩৬
আর্কিয় যুগ ১, ৩, ১২, ১৭
আফ্রিকান পাত ৩
আফ্রিকার মধ্য প্রস্তর যুগ (MSA) শিল্প ৩২
আত্তিরামপাক্কাম
  পাওয়া গেছে "পুরনো কালের আর্কিয়" হাতিয়ার ২৮
আঞ্চলিক সংস্কৃতির উদ্ভব ২৯
আমেরিন্ডিয়ান মানুষ ৩৭
অ্যাকসিলারেটর মাস স্পেকট্রোমিটার ৪৭
অ্যাসথেনোস্ফিয়ার ৩
অ্যাকিউলিয়ান শিল্প ২৭
অ্যাকিউলিয়ান হাতিয়ার ২৮, ২৯

ই

ইউরেনিয়াম - থোরিয়াম (U-Th) পদ্ধতি ২৯, ৪৫
ইউরেশিয়া পাত ৩, ৫
ইয়াংসো সংস্কৃতি (উত্তরের চীন) ৭২
ইলেকট্রন স্পিন রেজোন্যান্স পদ্ধতি ৪৮

উ

উটনুর
দক্ষিণের নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ৭৩
উদ্বৃত্ত উৎপাদন ৫২

ঋ

ঋগবেদ ৭৬

এ

এলান্ডসফনটেন (দক্ষিণ আফ্রিকা)
পাওয়া গেছে অ্যাকিউলিয়ান শিল্পকৃতি ৩১

ও

ওলডুভাই ঘটনাবলী ১৮
ওলডোয়ান হস্তশিল্প ২৩
হাতিয়ার ২৫, ৪৩
ওরিজিন অফ স্পেসিস ২১

ক

কচ্ছের রান ৬, ৭৬
করোটির (মগজের খোপের) ক্ষমতা ২২, ২৩
কাটবার (টুকরো করে) হাতিয়ার (কাটারির মত) ২৬, ২৭
কারা কামার (আফগানিস্তান)
পাওয়া গেছে হাতিয়ার ৩৬
কারাকোরাম পর্বতমালা ১০
কার্বন-তারিখ ৪৬, ৪৭, ৬৬, ৬৮
কার্বন-কাল-নির্ণয় ৪৬, ৬৬
কার্বন-14-(রেডিও কার্বন) পদ্ধতি ৩১, ৪৬, ৪৭, ৫৪
কার্বোনিফেরাস (লৌহ অঙ্গার) সময়কাল ৪
কারেওয়া ৭০
কিলি গুল মোহম্মদ (কোয়েত্তা)
প্রাক-মৃৎশিল্প খনন ৫৮, ৬৪
কুমোরের চাক ৫৭, ৭৩
কুঞ্জশোর,
সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চল ৮
কুডাপ্পা ব্যবস্থা ১৬
কেচি বেগ
পাওয়া গেছে মৃৎশিল্প ৬৪, ৭৩
কেনিয়াপিথেকাস ২১
কোডেকাল ৭৩
দক্ষিণের নব্য প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি
কোনসো (ইথিওপিয়া)
অ্যাকিউলিয়ান অঞ্চল ২৫
কোট দিজিয়ান
পরিণত সিন্ধু সংস্কৃতি ৭২
ক্যামব্রিয়ান কালপর্ব ৪, ১৬
ক্রমাঙ্কন ৪৬
ক্রেটাসিয়াসকাল ৫, ১২

গ

গন্ডোয়ানা ভূম ২
গন্ডোয়ানা-শিলা ৪

গুফক্রল (কাশ্মীর উপত্যকা)
নব্যপ্রস্তর যুগের অঞ্চল
গুহাচিত্র ৩৮-৪২
গার্হস্থীকরণ ৭২

ঘ

ঘগ্গর ৭৪
ঘর-ই-আসপ
নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার ৫৩
ঘালিঘাই (পাকিস্তান)
সোয়াত নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ৭২

চ

চাইল্ড, ভি. গর্ডন ৫০, ৫২
চিরান্ড (বিহার)
পাওয়া গেছে নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ৬৯
চোপনি মান্ডো (বেলান উপত্যকা)
আদর্শ নব্যপ্রস্তর যুগ ৬৬, ৬৮
চ্যুতিরেখা ৮

ছ

"ছিপছিপে" প্রজাতি ২২, ৩১, ৬৬

জ

জীবাশ্ম ৩-৫, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২১-২৩, ২৬, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৪৫
জেবু (ভারতীয় কুঁজওয়ালা ষাঁড়) ৫৪, ৫৫, ৬৬
জুরাসিক কাল ৩, ৫
জলিলপুর (পশ্চিম পাঞ্জাব)
হাক্রা পণ্য ৬৪
জৈব অবনয়ন ১৩

ট

টেথিস সাগর ৫
টেসিকটাস (উজবেকিস্তান) ৩৬
পাওয়া গেছে নিয়ানডার্থাল করোটি
"টোগু" পণ্যদ্রব্য ৫৯, ৬২, ৬৪
ট্রিয়াসিক কাল ১৪

ড

ডারউইন, চার্লস ১, ২১
ডেকান ট্রাপ ৫
ডেভোনিয়ান কাল ১২
ডেনড্রোক্রোনোলজি, জলবায়ুর তারতম্যের ক্রমপঞ্জী ৪৬

ত

তামা
সীলমোহর ৬১
হাতিয়ার ৫৯, ৬০, ৬৬
তামা-নিষ্কাশন ৬০, ৬৬, ৭৩

থ

থর মরুভূমি (রাজস্থান আর সিন্দ) ১১, ১৪, ৬৬, ৭৪
থারো
সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চল ৮
থার্মোলুমিনিসেন্স (TL) পদ্ধতি ৪৭

দ

দাহজলি হেডিং (উত্তর কাছাড় পর্বতাঞ্চল)
নব্য প্রস্তর যুগের অঞ্চল ৫৮
দারা-ই-কুর (আফগানিস্তান)
হাতিয়ার ৩৬
দামিনিসি (জর্জিয়া, ককেশাস)
পাওয়া গেছে জীবাশ্ম ২৬

দাক্ষিণাত্য/ভারতীয় উপদ্বীপ ৭, ৯
দাক্ষিণাত্যের শিলা ৫
"দাক্ষিণাত্য ফাঁদ" ৫
দ্বারকা ৮
দিদওয়ানা (রাজস্থান)
নিম্ন প্রাচীনপ্রস্তর যুগের অঞ্চল ২৯
দেবীমাতা ৬৪

ধ

ধারওয়ার ১৬
ধর্মীয় বিশ্বাস ৩৯, ৪২

ন

নব্যপ্রস্তর যুগ
গোষ্ঠী ৫১
সংস্কৃতি ৬০, ৬৪, ৬৬-৬৮, ৭০-৭৩
পুবের অঞ্চল ৬৬-৭০
উত্তরের অঞ্চল ৭০-৭২
দক্ষিণের অঞ্চল ৭৩
সময়কাল ৫০, ৫২-৫৪, ৫৭, ৬৪-৬৬, ৬৮-৭০, ৭২
বিপ্লব ১৪, ৫০, ৫২, ৭৪
সোয়াত ৭২, ৭৪
কারিগরি ৫০, ৫৪, ৫৫, ৫৯
হাতিয়ার ৩৮, ৫২-৫৪, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৭১, ৭৩
নর্মদা করোটি ২৯
নলাকার ক্ষুদ্র তুরপুণ ৬০
নবীন জগত ৩৩
নাটুফিয়ান মানুষ (সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের)
নব্যপ্রস্তর যুগের কারিগরির ব্যবহার ৫২
নেভাসা (মহারাষ্ট্র)
নিম্ন প্রাচীনপ্রস্তর যুগের অঞ্চল
সংস্কৃতি ২৯
নিম্ন প্রাচীনপ্রস্তর যুগ
শিল্পকৃতি ২৭
সংস্কৃতি ২৯

প

পটাসিয়াম-আর্গন (K-Ar) পদ্ধতি ১৮
পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ১৩
পাটনে (মহারাষ্ট্র)
পাওয়া গেছে মাইক্রোলিথ ৩৮, ৪৪
পাথুরে স্তর কাটা সংস্কৃতি ৩৭, ৩৮
পাথুরে হাতিয়ার ২৩, ২৫, ৩৩-৩৫, ৫০, ৫৩, ৫৭
পাণ্ডু রাজার ঢিবি (বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ)
নব্যপ্রস্তর যুগের দুটি পর্যায় ৬৯
পাব্বি পাহাড় ২৬
প্রত্ন-চুম্বকত্ব ১৮
প্রত্ন-জীবীয় সময় ৩
প্রজাতির উদ্ভব ২১
প্রাচীন পৃথিবী ২৬, ৩০
প্রাচীনপ্রস্তর যুগ
শিল্পকৃতি ২৭
সংস্কৃতি ২৯, ৩৪
সময়কাল ২৬-৩০
হাতিয়ার ৩০-৩৭
প্লেস্টোসিন যুগ ৫, ১০-১২, ১৪, ১৮, ২৮, ৭৮
পিঠওয়ালা ছুরির ফলা ২৬, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৫

ফ

ফা হিয়েন গুহা (শ্রীলঙ্কা) ৩
  পাওয়া গেছে জীবাশ্ম ৩৩
  পাওয়া গেছে হাতিয়ার ৩৮
ফিসন-পথ পদ্ধতি ৪৫

ব

বরদিয়া (গুজরাট)
  পাওয়া গেছে মাউস্টেরিয়ান হাতিয়ার ৩৬
'বলবান' প্রজাতি ২৬, ৩১
বঙ্গোপসাগর ১০
ব্রহ্মপুত্র নদ ৫, ৮
বাঘোর ৩৫, ৩৯
বাটাডোম্বা লেনা গুহা (শ্রীলঙ্কা) ৩৩
  পাওয়া গেছে আধুনিক মানুষের কঙ্কাল ৩৩
  পাওয়া গেছে মাইক্রোলিথ ৩৮
বারাঙ্কো লিওন (স্পেন)
  পাওয়া গেছে জীবাশ্ম ২৬
বাণিজ্য ৬০
বিনিময় (বার্টার) ব্যবস্থা ৬০
বুর্জাহোম ৭০
বুদ্ধপুস্কর (রাজস্থান) ৩৪
  এখানকার পিঠওয়ালা ছুরির ফলা
বেলি লেনা (শ্রীলঙ্কা)
  মধ্যপ্রস্তর যুগের অঞ্চল ৩৮
ব্রোঞ্জ যুগ ৫৮
"বৈদিক" যুগ
বিন্ধ্যায়ন-'ব্যবস্থা' ১৬
  নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ৬৮

ভ

ভারতীয় পাত ৩
ভীমবেটকা গুহা ১১, ৪৩
ভূ-গাঠনিক পাত ৩
ভূ-তাত্ত্বিক কাল ১, ৫

ম

মহাদহা (উত্তর প্রদেশ)
  পরবর্তী মধ্যপ্রস্তর যুগের অঞ্চল ৫০
মহাগড়
  বিন্ধ্যায়ন নব্যপ্রস্তর যুগের অঞ্চল ৬৮
মহাদেশীয় সঞ্চরণ ২
মরুর 'হারানো নদী' ৭৪
মধ্যপ্রস্তর যুগ
  গোষ্ঠী ৫৮
  সংস্কৃতি ৩৭-৪৩
  সময়কাল ২৬, ৩৫, ৫২-৫৪
  হাতিয়ার ৫০, ৫৯
মধ্যপ্রাচীন প্রস্তর যুগ ২৬-২৯, ৩৩-৩৭
মাইক্রোলিথ ৩৪, ৩৬-৩৮, ৫২, ৬৬
মাদ্রাজ শিল্প ২৬, ২৭, ৪৩
মুণ্ডিগাক (কান্দাহার) ৫৯
  টোগু সংস্কৃতি
মায়োসিন কাল ৫
মুলতান ৯
মুলাবাঁধ (মহারাষ্ট্র)
  পাওয়া গেছে মাউস্টেরিয়ান হাতিয়ার ৩৬
মেহরগড়
  নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব ৫২, ৫৪, ৫৭-৬০, ৬৫
মেরুপথ ২
মোজোরেটো (জাভা)
  পাওয়া গেছে জীবাশ্ম ২৬

মৌসুমী বায়ু ১১, ৭৪

য

যমুনা নদী ৭

র

রামাপিথেকাস ২১
রিয়াত (সোয়ান অববাহিকা)
পাওয়া গেছে জীবাশ্ম ২৬
রেনিগুন্টা (অন্ধ্রপ্রদেশ)
উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের অঞ্চল ৩৪
রোজড়ে (মধ্য প্রদেশ)
পাওয়া গেছে অস্ট্রিচের ছাল ৪২

ল

লবণাক্ত অঞ্চল ৮
লং গুপ্পো (চীন)
পাওয়া গেছে জীবাশ্ম ২৬
লেভোলইস মাউস্টেরিয়ান
(হাতিয়ার তৈরির পরিশীলিত কারিগরি) ৩১, ৩২, ৩৬
লুসি, কঙ্কাল-জীবাশ্ম ২২

শ

শর্মা ৬৭
শারীরিক গঠনে আধুনিক মানুষ (AMM) ৩১, ৩৪
শিলাস্তর
সূত্রায়নের আপেক্ষিক ক্রমপঞ্জী
শেরি খান তারাকাই (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)
পাওয়া গেছে হস্তশিল্প ৬৪
শোরাপুর দোয়াব (কর্ণাটক) ৩৪

স

সরস্বতী (নদী) ৭৬
সরসুতি ৭৬
সরুটুরু (কামরূপ, আসাম) ৬৮
সুতোর ছাপে চিত্রিত মৃৎশিল্প
সমাধিক্ষেত্র ৫৪, ৫৭
ধর্মীয় প্রথার ব্যবহার ৫৭
সরাইখোলা (পাকিস্তান)
উত্তরের নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ৭২
সারাই নাহার রাই (উত্তর প্রদেশ)
পরবর্তী কালের নব্যপ্রস্তর যুগের অঞ্চল ৪০
সামুদ্রিক প্রাণ
সাংঘাও গুহা (পাকিস্তান) ৩৬
পাওয়া গেছে হাতিয়ার
সিলুরিয়ান শিল্প ১২
সিবাপিথেকাস ২১
সৌরাষ্ট্র বেলাভূমি ৮, ১৫
স্কোয়ার্জবার্গ ৮, ২০
সোয়ান অববাহিকা ২৭
নিম্ন প্রাচীনপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ২৯
মধ্য প্রাচীনপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ৩৪, ৪৪
সোয়ান উপত্যকা ২৯
সুল্যাইমান পর্বতশ্রেণী ৮
সুতোর ছাপের অলংকরণ ৬৮, ৬৯
স্তরকাটা ছুরির ফলা
হাতিয়ার ২৬, ২৮-৩০
সংস্কৃতি ২৫, ৩৭

হ

হলসিন যুগ ৭, ১১, ১২
হস্তশিল্প ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮

হস্তশিল্পীর সমাধি ৫৭
হাও বিন হিয়ান সংস্কৃতি (ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের) ৬৮
হাড় ৫৭, ৫৯, ৬৪, ৬৯
হাথনোরা
পাওয়া গেছে নর্মদা করোটি ২৯
হারানো যোগসূত্র
অনুসন্ধান ২১
হাক্রা ৭৬
হাক্রাপণ্য ৬৪
হাক্সলি, টমাস ২১
হ্যাণ্ডি অববাহিকা (কর্ণাটক) ২৮
মধ্য প্লেস্টোসিন অঞ্চল
হিমযুগ ৫, ৬, ১০-১২
হিম বিরতি পর্ব ৬, ১০-১২
হিমালয় পর্বতমালা
পাওয়া গেছে জীবাশ্ম ৪
হোমিনিড (প্রজাতি)
বিবর্তন ২১-২৫
হোমো এরগাস্টার ২৩
হোমো ইরেকটাস ৫, ২৬, ২৮-৩১, ৩৩
হোমো হাবিলিস ৫, ২৩, ২৪, ২৬
হোমো স্যাপিয়েন্স আর্কিয় ৩১
হোমো স্যাপিয়েন্সের উদ্ভব ৩১
হোমো স্যাপিয়েন্স নিয়ানডার্থাল ৩১
(নিয়ানডার্থাল মানুষ)
হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স ৩০, ৩১